লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

ঈদুল আযহা সংখ্যা

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮১ বর্ষ | ২য় ও ৩য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ শ্রাবণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ৩ জিলহজ্ব, ১৪৩৯ হিজরি | ১৫ যহুর, ১৩৯৭ হি. শা. | ১৫ আগষ্ট, ২০১৮ ঈসাব্দ

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

কুরবানীর অম্লান স্মৃতির ধারক ‘পবিত্র কাবাগৃহ’

২৩ মে ২০১৮ একই তারিখে সংঘটিত দু’টি ‘নিদর্শন’

সিয়ালকোট: ওরা (পাকিস্তানী মোল্লারা) নিজদেশে আল্লাহর ঘর ‘মসজিদ’ শহীদ করে তাঁর কোপানলে পতিত

ভিনদেশ কানাডায় আহ্‌মদীরা আল্লাহর ঘর ‘মসজিদ’-এর বিস্তার ঘটিয়ে তাঁর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত

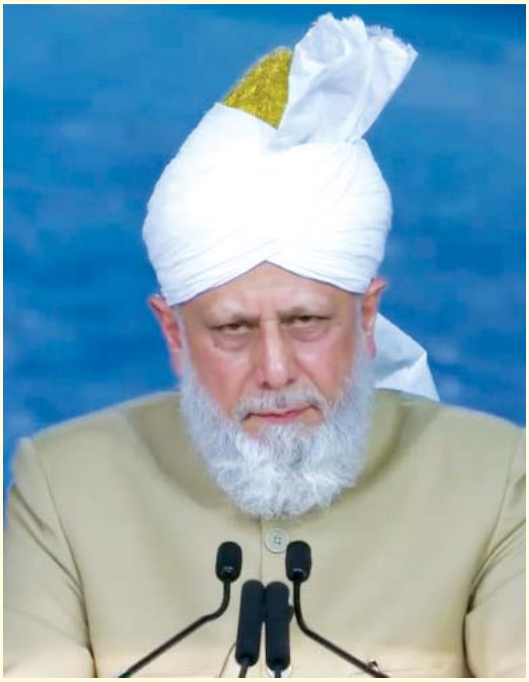

যুক্তরাজ্যের ৫২তম বার্ষিক জলসার উদ্বোধনী বক্তৃতায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) নিম্নোক্ত দোয়াগুলো শেখার ও পাঠ করার তাহরীক করেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (সহীহ্ মুসলিম)

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইবরাহিমা ওয়া আলা আলি ইবরাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরের প্রতি সেভাবে রহমত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত বর্ষণ করেছিলে, নিশ্চয় তুমি মহা প্রসংশিত ও মহা মর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরের প্রতি সেভাবে কল্যাণ অবতীর্ণ কর যেভাবে তুমি ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের প্রতি কল্যাণ অবতীর্ণ করেছিলে, নিশ্চয় তুমি মহা প্রসংশিত ও মহা মর্যাদাবান।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (সূরা আলে ইমরান : ৯)

(উচ্চারণ: রাব্বানা লাতুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাহ্, ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্হাব।)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের এক বিরাট রহমত দান কর, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা।

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)

(উচ্চারণ: রাব্বানাগফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফী আমরিনা ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন।)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের পাপসমূহ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালড়ঘন মা কর আর আমাদেরকে দৃঢ়তা দান কর এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (সূরা আল আ'রাফ : ২৪)

(উচ্চারণ: রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগ্ফিরলানা ওয়া তার্হাম্না লানা কুনান্না মিনাল্ খাসিরীন।)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের প্রাণের ওপর জুলুম করেছি তাই তুমি যদি আমাদেরকে মা না কর আর আমাদের প্রতি দয়া না কর তাহলে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল বাকারা: ২০২)

(উচ্চারণ: রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া কিনা আযাবান্নার।)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর আরআমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রা করে।

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُکَ فِیْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِکَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ও আবু দাউদ শরীফ)

(উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম।)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তোমাকে (তাদের অন্তর্দাহ থেকে রক্ষা পাবার জন্য) তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ (সহীহ্ বুখারী)

(উচ্চারণ: রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বী ফাহ্ফায্নী ওয়ান্সুরনী ওয়ার্ হামনী।)

অর্থ: হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তার বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

সম্পাদকীয়

মানব সভ্যতার উন্নতি অগ্রগতি ও স্থায়ীত্ব খোদাবিমুখতায় নয় বরং তাঁর সমীপে বিনীত নিবেদনে- আত্মসমর্পণে

ধর্মকে, আধুনিক বিশ্ব যদিও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে একে প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় মানবজাতিতে বিস্তৃত সমষ্টিগত–মনোজগতের (Collective-Psychological) বিষয় মনে করে; তবুও বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে ধর্মের অবস্থান সর্বদাই শীর্ষে।

অপরদিকে খোদাবিমুখীরা সর্বদা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করার অযৌক্তিক চেষ্টা চালিয়ে মানুষকে 'আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন' থেকে দূরে রাখার জন্য বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়ে থাকে; যাতে 'আল্লাহ নেই' ধারণাটিকে তাদের মনে বদ্ধমূল করা যায়। আর এতে সক্ষম হলে বস্তুবাদীতার মুখে ঠেসে দিয়ে পার্থিবতায় ডুবে থাকা মানুষকে সহজেই বিভ্রান্ত ও বঞ্চিত করা যায়। ধর্মকে তখন নিরর্থক মনে হয়, লোপ পায় নৈতিকতাও।

এই লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি উপায়ে দর্শনতাত্ত্বিক আন্দোলন থেকে শিল্প, সাহিত্য ও বাণিজ্যে, প্রচারমাধ্যমে পরিবেশিত টক-শো থেকে ডাইনিং টেবিলে পারিবারিক আলোচনায় ঝড় তোলা , সর্বত্র ছদ্ম-আধুনিকতার এই অপপ্রয়াস চলছেই; যা মূলত দাজ্জালী ফেৎনার অপর নাম।

লালসাপূর্ণ সেই চিন্তাধারার ফলস্বরূপ সর্বত্র বিরাজ করছে আস্থাহীনতা, হতাশা আর নৈরাজ্য। আস্থাহীনতার এই বিষ-বাস্প আজ কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বকে।

নির্ভরশীলতার অনুপস্থিতি অস্থির করে তুলেছে দাম্পত্যজীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তঃ এবং আন্ত-সম্পর্কগুলোকে। দিশেহারা মানুষ এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে খুঁজে ফিরছে নানা পথ, কিন্তু সন্ধান মিলছে না সেই কাঙ্খিত শান্তি ও নিরাপত্তা।

ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নত জীবন লাভের প্রাতিষ্ঠানিক পাদপীঠ হলো পরিবার। ভবিষ্যত প্রজন্ম কোন দিকে এগিয়ে যাবে এর ভিত্ রচিত হয় এখানেই। হযরত ইব্রাহীম (আ.) পবিত্র কাবাগৃহ আবাদ করার মাধ্যমে নিজ পরিবারকে আল্লাহ্-তে আত্মসমর্পণের উন্নত ও মহান এ শিক্ষাটিই দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি যত দ্রুত সবাই বুঝে যায় ততই মানবজাতির মঙ্গল। এজন্য অবশ্যই প্রতিটি পরিবারে খোদামুখী গঠনমূলক শিক্ষা প্রদানের প্রোগ্রাম থাকা চাই। সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে এর বাস্তবমুখী প্রয়োগে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র নিয়ে বহু শতাব্দী ধরে আমরা একই জাতিসত্তা হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের প্রিয় এই মাতৃভূমিতে বসবাসরত আছি। তাই বর্তমানে বিভ্রান্তিকর, অস্বচ্ছ, বিপজ্জনক ও চরমপন্থীরূপে পরিলক্ষিত পরিবর্তনগুলোকে সঠিক রাস্তা দেখানোর দায়িত্ব এখন আমাদেরই ওপর বর্তায়। কেননা বর্তমানে ঐশী যুগ-সংস্কারকের মান্যকারী আমরা, আহমদীরা।

আধুনিক, উদার ও শিক্ষিত যেকোন ব্যক্তি উপরে বর্ণিত এই বিবৃতিতে যদিও সম্মত হবেন, তবে বাস্তবতা হলো, এটি কতই না দুরূহ কাজ!

বিশেষভাবে এমন একটি সমাজ, যেখানে উদারবাদ, ব্যক্তিত্ব এবং আধুনিকতার নামে উন্নয়নের জানালা দিয়ে ধর্মকে বাইরে নিক্ষেপ করা হয়; অথবা ধর্ম সুরক্ষার নামে চরম ধর্মান্ধতার বিস্তার ঘটানো হয়, চালানো হয় আত্মঘাতি সন্ত্রাসী হামলা। আমরা দেখেছি, এমন সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের চিন্তা-চেতনা ও গতিপথ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়ে খুব দ্রুত গতিতে নিম্নমুখী মানবেতর পৈশাচিক স্তরে পতিত হয়।

ফলে ধর্ম, পারিবারিক বন্ধন, পিতামাতার প্রতি দায়িত্বপালন, নম্রতা, সতীত্ব, সত্যতা, সততা এবং মমত্ববোধসহ অন্যান্য সকল স্তরের মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ লাগামহীন জীবনযাপনের দিকে ছুটে চলছে, যার বহু দৃষ্টান্ত আজ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সবখানেই দৃশ্যমান।

আল্লাহ তা'লা করুণাভরে তাঁর প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ নবী-রসূলগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য ধর্মের বিধানে 'করো আর করোনা'-এর যে জীবনকোড দান করেছেন এতে প্রদত্ত নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষার সীমাবদ্ধতা জংলী অসভ্য মানুষকে সভ্য বানিয়েছে। মানব সভ্যতার গোড়া পত্তন হয়েছে এভাবে; আর তা এগিয়েওছে এভাবেই। সর্বকালের জন্য যুৎসই ও টেকসই এবং পরিপূর্ণ একমাত্র ধর্মবিধান নির্ধারিত হয়েছে **'ইসলাম'**।

এ পথেই লাভ হয় নিরাপদ জীবন, মেলে আস্থা ও আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টি। উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ পরিবর্তিত হয় প্রশান্তিতে। আমাদের সকরুণ প্রার্থনা- প্রত্যেক উৎকণ্ঠিত মানবাত্মা এ চিরন্তন সত্য দ্রুতই বুঝে যাক আর তাঁর সমীপে আত্মসমর্পণ করুক, পরিতৃপ্ত ও সিক্ত হোক তাঁরই করুণাধারা বর্ষণে।

আসন্ন 'ঈদুল আযহা'র মহান এ শিক্ষাকে সামনে রেখে সকলকে–

"ঈদ মুবারক"!

সূচিপত্রে

৩১ জুলাই ও ১৫ আগষ্ট, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) (সন্দেহ-সংশয় নিরসন) ৬
প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের **ঈদুল আযহার খুতবা**

'জ্ঞানই হচ্ছে তবলীগের উপায়' ১৪
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইউ, কে-এর ২০১৮ সনের মজলিস শুরায়
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

বিশ্বশান্তিঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ১৯
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

কুরবানীর উদ্দেশ্যঃ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ২২
মাহমুদ আহমদ সুমন

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ২৫
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

সেলুকাস!
বিচিত্র এক দেশ– পাকিস্তান ২৮
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

জীবনলিপিঃ ৩১
হযরত হাজী আব্দুল করীম সাহেব

ঈদুল আযহা ও প্রসঙ্গ কথা ৩৬
কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

কলমের জিহাদ ৩৮
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

জুমু'আর দিনের গুরত্ব ৪১
ফুরাদ আহমদ

আল্লাহ্ পাক ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা ৪২
গোলামী করা অমর্যাদার কাজ
খালিদ আহমেদ সিরাজী

আহ্! ধর্মে অন্তঃপ্রাণ ৪৩
খেলাফতে আহমদীয়ার একনিষ্ঠ এক সেবক
মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব
আমাদের মাঝে আর নেই

সংবাদ ৪৫

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র
সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

رَبُّكُمُ الَّذِيْ يُزْجِيْ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٦٧﴾

৬৭। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকই তোমাদের নৌযানগুলোকে সাগরে চালিয়ে থাকেন যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার। নিশ্চয় তিনি তোমাদের প্রতি বার বার কৃপাকারী।

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ﴿٦٨﴾

৬৮। আর সমুদ্রে তোমাদের উপর যখন বিপদ এসে পড়ে তখন একমাত্র তিনি ছাড়া তোমরা অন্য যাদের ডেকে থাক তারা (তোমাদের মন থেকে) উধাও হয়ে যায়। এরপর তিনি যখন তোমাদের রক্ষা করে স্থলে নিয়ে আসেন তখন তোমরা (তাঁর দিক থেকে আবার) মুখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿٦٩﴾

৬৯। তোমরা কি এ (ব্যাপারে) নিরাপদ হয়ে গেছ যে, তিনি স্থলভাগের কিনারায় তোমাদের পুঁতে দিবেন না অথবা তোমাদের উপর এক প্রচণ্ড ঝড় পাঠাবেন না? তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কার্যনির্বাহক খুঁজে পাবে না।

اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ﴿٧٠﴾

৭০। অথবা তোমরা কি এ (ব্যাপারেও) নিরাপদ হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদের আর একবার সেখানে (অর্থাৎ সাগরে) ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তোমাদের উপর এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু বইয়ে দিবেন না এবং তোমাদের অকৃতজ্ঞতার দরুন তোমাদের ডুবিয়ে দিবেন না? তখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে নিজেদের জন্য কোন প্রতিশোধ গ্রহণকারী খুঁজে পাবে না।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْۤ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ﴿٧١﴾ ع

৭১। আর অবশ্যই আমরা আদম সন্তানকে[১৬৩৫] সম্মানে ভূষিত করেছি। আমরা এদেরকে জলেস্থলে[১৬৩৫-ক] বাহন দান করেছি, পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে রিযক দিয়েছি এবং আমরা যাদের সৃষ্টি[১৬৩৫-খ] করেছি তাদের অনেকের উপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

১৬৩৪। মানুষের স্বভাব এমনই যে, যখন সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন সে নম্র হয় এবং আল্লাহ তা'লার নিকট প্রার্থনা করে, প্রতিজ্ঞা করে এবং সৎ জীবনযাপন করবে বলে শপথ করে। কিন্তু একবার বিপদমুক্ত হয়ে গেলেই সে পূর্ববৎ অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে যায়।'

১৬৩৫। সকল আদম সন্তানকে আল্লাহ তা'লা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেন নি। এই আয়াত বর্ণ, ধর্ম, বংশ ও জাতিভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মূর্খ ও বিচারবুদ্ধিহীন সকল ধারণাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের সকল উপায় বা পথ সকল মানুষের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত এবং এই সমস্ত পথ বা উপায় তার জন্য জলে ও স্থলে সমভাবে প্রযোজ্য।

১৬৩৫-ক। কুরআন করীমে সমুদ্র ভ্রমণের উপর জোর দেয়াকে অস্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়। সকল আরবের মধ্যে মহানবী (সা.)-এর সারা জীবনে সমুদ্র যাত্রার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। এমন একজন আরববাসীর নিকট অবতীর্ণ হওয়া এক কিতাবে সমুদ্র ভ্রমণের গুরুত্বের উপর এত বেশি জোর দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে, কুরআন তাঁর (সা.) রচনা হতে পারে না। কেননা তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমুদ্র ভ্রমণের উপকারিতা জানতেন না।

১৬৩৫-খ। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'লার প্রতিনিধিত্বকারী মর্যাদার অধিকারী মানুষ অন্য সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রতি বছরই কুরবানী করা আবশ্যক

* হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রতি বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

* হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ)।

* হযরত আনাস (রা.) বলেন, এক ঈদে রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধুসর রঙের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। এদেরকে তিনি নিজ হাতে যবাই করলেন এবং যবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বল্লেন। আনাস (রা.) বলেন, যবাই করার সময় আমি তাঁকে সেগুলোর পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে দেখেছি এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে শুনেছি (প্রাগুক্ত)।

* হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর নিমিত্তে বন্টনের জন্য তাকে (উকবাকে) কতগুলি ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর এক বছর-বয়সী একটি বাচ্চা-ছাগল রয়ে গেল। বিষয়টি তিনি রাসূলুল্লাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর (সা.) বললেন, তা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানী কর। অপর বর্ণনামতে, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা-ছাগল থাকল। হুযূর (সা.) বল্লেন, তুমি তা দ্বারাই কুরবানী কর (প্রাগুক্ত)।

* হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহেই কুরবানীর পশু যবাই করতেন বা নহর করতেন (বুখারী)।

* হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক যখন আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে-ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে, সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাটে (মুসলিম)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি, যে পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছিদ্র করা হয়েছে বা যার কান পিছনের দিকে ফিরে গেছে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

* হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন যে, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু কুরবানী না করি (ইবনে মাজাহ্)।

* হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরবানী কী? হুযূর (সা.) উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের সুন্নত (নিয়ম)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের কী (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে। তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের ক্ষেত্রে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)।

অমৃতবাণী

প্রকৃত প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

"আরেকটি উপাসনার নাম হচ্ছে হজ্জ, যার অর্থ এটা নয় যে, ন্যায় বা অন্যায় পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা কেউ সাগর পাড়ি দিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করে এবং কাবার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের নির্দেশানুযায়ী নামায ও অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন করার পর ফিরে এসে গর্ব সহকারে বলে বেড়ায় যে, সে হজ্জ করে এসেছে। হজ্জের যে উদ্দেশ্য আল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন, তা এভাবে লাভ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, হজ্জ-যাত্রীর ভ্রমণের মূল লক্ষ্য হবে, সে যেন তার সকল কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও ভক্তিতে আপ্লুত হয়। একজন প্রকৃত-প্রেমিক তার আত্মা ও অন্তরকে পূর্ণরূপে কুরবানী করে আর আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ তারই প্রকাশ্য-রূপ" (১৯০৬ সালের সালানা জলসার ভাষণ, 'ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে এর তুলনা' হতে গৃহীত)।

"ক্বা'বাগৃহ প্রদক্ষিণকারী হাজী নিজের সকল কাপড় ছেড়ে এক কাপড় পরিধান করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক হাজী তার বাহ্যিকতার সকল পোশাক পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন-হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্নিধানে হাজির হয়। কারণ, তখন সে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে। একজন হাজী বাহ্যিকভাবে ক্বাবা প্রদক্ষিণ করে দেখায় যে, তার হৃদয়ে স্বর্গীয়-প্রেমের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে এবং সে সত্যিকার প্রেমিকের ন্যায় তার প্রেমাস্পদের গৃহ প্রদক্ষিণ করে। প্রকৃতপক্ষে সে তার সকল কামনা-বাসনা ছিন্ন করে নিজের সকল স্বার্থ তার প্রভুর নিকট কুরবানী করে। ইসলামী আইনে হজ্জের প্রকৃত অর্থ এটাই"। ('ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সাথে তার তুলনা,' মূল রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"এবং যারা হজ্জ পালনে ব্রতী হয়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হজ্জের প্রকৃত- তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তার বাহ্যিক কর্ম আধ্যাত্মিক হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার হজ্জব্রত পালন প্রাণহীন ও অর্থহীন।

কিন্তু অনেক ব্যক্তি এমন আছেন যে, লোকে তাদেরকে 'হাজী' বলুক, এ জন্যই অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পবিত্র কা'বাগৃহে গমন করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নিকট তাদের হজ্জ গৃহিত হয় না, কেননা, তারা শাঁসবিহীন খোলস মাত্র" (১৯০৬ সালের ২৬শে ডিসেম্বর সালানা জলসার বক্তৃতা-রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৭)

"দ্বিতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে, এই মাস 'ত্যাগের মাস' বলে পরিচিত। হযরত রাসূল করীম (সা.) আবির্ভূত হয়েছিলেন ত্যাগের উত্তম উদাহরণ দানের জন্য। যেমনভাবে তোমরা ছাগল গরু, উট এবং ভেড়া কুরবানী দিয়ে থাক, তদ্রূপ আজ হতে তেরশ' বছর পূর্বে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পথে মানুষ নিজেদের জীবন কুরবানী করে দিত। সেটাই ছিল প্রকৃত 'বড় ঈদ' এবং ওটাই ছিল প্রকৃত সেই সময়, যখন জগৎকে প্রভাতের আলো প্রদর্শন করা হয়েছিল।

বর্তমানে পশু জবাই করার মাধ্যমে যেভাবে কুরবানী করা হয়, উহা কুরবানীর শাঁস নয়, কুরবানীর খোলস মাত্র। উহা আত্মা নয়, দেহ মাত্র।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১১তম কিস্তি)

লক্ষ্য কর হে উদাসীনগণ! লক্ষ্য কর যে, ইসলামী সৌধকে বিধ্বস্ত করতে তারা কী চরম পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে! কত বিপুল পরিমাণে এতদসংক্রান্ত উপকরণাদি সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এগুলোর বিস্তার সাধনে নিজেদের জীবন বিপন্ন হওয়ার শঙ্কায় ফেলে এবং পানির ন্যায় অর্থ ব্যয় করে তারা এমন সব প্রচেষ্টা চালিয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয়, এ পথে যেন মানবীয় শক্তি-সামর্থ্যের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। এমনকি চরম নির্লজ্জ উপায় ও পবিত্রতা বিবর্জিত ঘৃণ্য পরিকল্পনাও অবলম্বন করা হয়েছে। আর সত্য ও ঈমানদারীর বিলোপ সাধনে নানা ধরনের সুরঙ্গ তৈরী করা হয়েছে। ইসলামের চিহ্ন মিটিয়ে দিতে মিথ্যা, বানোয়াট আর কৃত্রিমতার সার্বিক সূক্ষ্ম বিষয়াদি প্রাণান্তকর উপায়ে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সহস্র সহস্র কেস্‌সা-কাহিনী ও তর্কবিতর্কের পুস্তকাদি শুধুমাত্র মিথ্যা ও বানোয়াটস্বরূপ এবং কেবল এ উদ্দেশ্যে রচনা করা হয়েছে যাতে অন্য উপায়ে না হলেও এ উপায়েই মানুষের মনে (ইসলাম সম্পর্কে) বিরূপ প্রভাব পড়ুক। রাহাজানির (তথা ঈমান হরণের) এমন কোনো পন্থা নেই যা এতদ উদ্দেশ্যে আবিষ্কার করা হয়নি। বিপথগামী করার এমন কোনো পদ্ধতি নেই যার আবিষ্কারক এরা নয়। থাকলে বলুন, সেটি কী বাকি আছে?

অতএব এই হলো খ্রিষ্টান জাতি ও ত্রিত্ববাদ মান্যকারীদের পক্ষ থেকে যাদুসুলভ (মিথ্যা ও প্রতারণামূলক) কার্যক্রম এবং যাদুর সেই পরিপূর্ণ পরিচিতিমূলক নমুনা যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের দাজ্জাল তথা প্রতিশ্রুত দাজ্জাল ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কাজেই পাদ্রী সাহেবদের যে সম্প্রদায়টি রয়েছে এদেরকেই সেই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল বলে মানতে হল। বস্তুতপক্ষে আমরা যখন দুনিয়ার অধিকাংশ বিগতকালের দিকে তাকাই তখন আমাদের দৃষ্টি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রতীয়মান এ সাক্ষ্যটি সহকারেই ফিরে আসে যে, সময়কালের বিগত ধারায় যতদূর সন্ধান করা সম্ভব, দাজ্জালিয়তের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যে এবং এতে কার্যত: সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে এ লোকদের কোনো জুড়ি নেই। এদের এসব যাদুসুলভ প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যা কার্যকলাপে অন্য কেউ এদের সমকক্ষ নয়। আর যেহেতু সহীহ্ হাদীসাবলীতে প্রতিশ্রুত দাজ্জালের পরিচয়ে এ চিহ্নটিই লিখা আছে যে, সে এমন সব নৈরাজ্যের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটাবে যে এখন থেকে দুনিয়ার যত দূর সম্ভব সৃষ্টিকাল পর্যন্ত দৃষ্টিপাত করলে এর কোন নজির খোঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব এ বিষয়ে নিশ্চিৎ বিশ্বাস করা উচিত, যে-খ্রিষ্টীয় দাজ্জাল 'গির্যায় অবরুদ্ধ অবস্থা' থেকে ছুটে বের হবে সে বস্তুতপক্ষে উল্লেখিত এ লোকগুলোই বটে, যাদের প্রতারণামূলক যাদুর মোকাবেলায় মু'জিযা (বা অলৌকিক ক্রিয়া) আবশ্যকীয় ছিল। যদি তা অস্বীকার করা হয় তাহলে বিগতকালের দাজ্জালদের মাঝে এদের নজির পেশ করা উচিত।

অতএব প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র পূর্বেই দাজ্জালের আসা আবশ্যকীয় ছিল এ প্রশ্নের উত্তর এখন স্পষ্ট হল। দুনিয়া জুড়ে পঙ্গপালের ন্যায় ছড়িয়ে পড়া খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সম্প্রদায়টি যে মসীহ্ সম্পৃক্ত সেই দাজ্জাল, যার আসার অপেক্ষা ছিল– এ বিষয়টি প্রমাণ সিদ্ধ পর্যায়ে উপনীত হল। অতএব হে বুযূর্গ(শ্রদ্ধাভাজন) মহোদয়গণ! প্রতিশ্রুত দাজ্জাল তো এসে গেছে। কিন্তু আপনারা তাকে সনাক্ত করতে পারলেন না। তুলাদন্ড হাতে নিন আর মাপজোক করে পরখ করে দেখুন, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ক্ষেত্রে এদেরকে ছড়িয়ে যায়, এদের চেয়েও বড় অসৎ কোন দাজ্জালও কি আসতে পারে?

আপনাদের কল্পনায় যে-দাজ্জাল রয়েছে তার সম্পর্কে আপনারা এ হাদীস পেশ করে থাকেন : "দাজ্জালের ফেৎনা বা নৈরাজ্য এতো বেশি ও বড় আকারের হবে যে সত্তর (৭০) হাজার মুসলমান তার অনুগত ও ভক্ত অনুসারী হয়ে যাবে।" কিন্তু এ জায়গায় তো লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামধর্ম ত্যাগ করেছে এবং ক্রমাগতভাবে ত্যাগ করে চলেছে। তোমাদের যুবক-যুবতী তোমাদের বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজন এবং তোমাদের বড় বড় বুযূর্গ ও আওলিয়ার সন্তানরা এবং তোমাদের বড় বড় অভিজাত পরিবারের সদস্যরা এই দাজ্জালী ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। এটা কি ইসলামের জন্যে বিলাপের জায়গা নয়?!

ভেবে দেখ, কী বিপুল পরিসরে এ লোকগুলোর নৈরাজ্য বিস্তার ঘটিয়েছে এবং কী বিপুল পরিমাণে এলোকগুলোর প্রচেষ্টা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে! প্রবঞ্চনা ও ষড়যন্ত্রের এমন কোনো কণা পরিমাণও কি অবশিষ্ট আছে যা তারা (ঈমান হরণমূলক) রাহাজানির ক্ষেত্রে কার্যকর করে নি?! এতোদ্দেশ্যে রচিত কোটি কোটি সংখ্যক বই-পুস্তক দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সহস্র সহস্র প্রচারক ও মিশনারী এ উদ্দেশ্যেই যত্রতত্র নিযুক্ত করা হয়েছে। কোটি কোটি অঙ্কের টাকা এ পথে ব্যয় করা হচ্ছে। অত্যন্ত দুর্গম পথ দিয়ে তারা বিপদসঙ্কুল পাহাড়ী অঞ্চলে এবং ইয়াগস্থান ও কাফিরস্থান (ভারতবর্ষের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী) অসভ্য জাতি এবং আফ্রিকার বন্য লোকদের কাছে যায় এবং একই উদ্দেশ্যে তারা সদাসর্বদা জল ও স্থলে সফর করতে থাকে। যাতে কোন মানুষকে ফুসলিয়ে দলে ভেড়ানো যায়। আদমের যুগ থেকে আজঅবধি যেসব মানুষ বিভিন্ন উপায়ে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে যত রকম প্রতারণামূলক কৌশল কাজে লাগিয়েছে সেই সবগুলোর সমষ্টি এই খ্রিষ্টান মিশনগুলোতে বিদ্যমান। কোনো ব্যক্তি যদি বছরকালব্যাপী ভাবতে থাকে আর বিভ্রান্ত করার নিত্য-নতুন ধোকা (মূলক কৌশল) খুঁজে বের করে তাহলে পরিশেষে যখন চিন্তা করে দেখবে তখন সে ঐ যাবতীয় ধোকাবাজী উল্লিখিত খ্রিষ্টান মিশনগুলোতে বিদ্যমান দেখতে পাবে।

যথাশীঘ্র সময়ে এলোকগুলো চিকিৎসকের পদও লাভ করে থাকে যাতে করে আর কিছু না হোক বিপদগ্রস্ত রুগীদের কাবু করা যায়। বিপুল পরিমাণ শস্যদানা ক্রয় করা হয় যাতে দুর্বিক্ষগ্রস্ত লোকদেরকে সেই শস্যদানা বিনামূল্যে দান করা যায়। আর সেই সাথে প্রচারমূলক কিছু উপদেশবাণীও শোনানো হয়। অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায়, রবিবারে পাদ্রী সাহেবদের 'খয়রাতখানা' খুলে যায় এবং সেখানে বহু সংখ্যক গরবী-মিসকিন একত্র হয়ে থেকে এবং যথাসময়ে ধর্ম প্রচারে কিছু উপদেশ বাণী শুনিয়ে কিছু টাকা-পয়সা তাদের দান করা হয়।

পাদ্রীপদে অধিষ্ঠিত কিছুসংখ্যক 'মিস' উভয় বেলায় মানুষের বাড়ী-ঘরে ঘুরে বেড়ানোর রীতি নির্ধারণ করে রেখেছে। তারা উচ্চ অভিজাত পরিবারের মেয়েছেলেদের সেলাই ও সূতার বিভিন্ন রকম কাজ শেখায়। (ঈমান হরণে) রাহাজানির জন্যে সিঁধকাটার যন্ত্রও তাদের বগলে রাখা থাকে। সুযোগমত এ অস্ত্রও চালানো হয়। কাজেই ভালো ভালো খান্দানের বহু যুবতী মেয়েরা এবং নবাব ও শাহ্‌যাদাদের সন্তান আখ্যায়িত হয়েও মিস্ সাহেবাদের প্রচেষ্টায় খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে যায়। আর সেই সব পর্দানশীন ও সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক যারা আজীবন কখনও বেগানা পুরুষের চেহারা দেখে নি, এখন তারা খ্রিষ্টান হয়ে 'না-মাহ্‌রাম' (তথা যাদের সাথে শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ্-বন্ধন বৈধ এমন) পুরুষদের হাতে হাত দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। 'পবিত্র ভালোবাসার' ধারণা নিয়ে 'না-মহ্‌রাম' পুরুষ যদি চুমুও খায় তাহলে কিছু মনে করা হয় না। আর তারা যে কখনও মদের নামও শোনে নি এখন তারা এই পংকিল 'রস' (তথা মদ) নিয়ে রাত-দিন উন্মত্ত থাকে এবং ব্রাণ্ডী, শেরি, হিস্কি, পোট ওয়াইন ইত্যাদি মদের নাম তাদের কণ্ঠস্থ। আর তেমনি মুসলমানদের হাজার হাজার লা-ওয়ারিশ শিশু-সন্তানরা এ লোকদের দখলে এসে এবং তাদের ঐসব প্রবঞ্চনা ও বিভ্রান্তিকর শিক্ষায় গড়ে ওঠে এখন ইসলামের চরম শত্রুরূপে এদের দেখা যায়। এমন কোন ফেৎনা বা নৈরাজ্য উদ্দীপক কাজ কি মানুষের কল্পনায় আসতে পারে যা এ লোকগুলো করে দেখায় নি? ইসলামধর্ম বিনাশী এমন কোনো তদ্বির (কৌশল) কী অবশিষ্ট আছে যা তাদের মাধ্যমে কার্যকর হয় নি? এখন ন্যায়-বিচারের দাবী হবে, দুনিয়ায় সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনামূলক সব কাজে ও দাজ্জালিয়তের সব ক্ষেত্রে উল্লিখিত এ লোকদের নাম্বার যখন সবার ওপরে প্রতীয়মান হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে এ রকম মহামারীর প্রাদুর্ভাবের আদ্যপান্ত এর কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না এবং এ লোকদের বিষাক্ত প্রভাবে অনেক মানুষ পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, অনেকের অর্ধাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; অনেকের রক্তে শ্বেতগ্রস্ত রুগীদের মতো জীবানু সঞ্চার লাভ করেছে– যাদের মুখমন্ডলে শ্বেতের বড় বড় দাগ দেখা যায়। নও-খ্রিষ্টানদের নতুন প্রজন্মের বিস্তৃতির দরুন জন্মান্ধদের দলও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তমাশাচ্ছন্ন স্বভাবের কোটি কোটি মানুষের ভেতর নাপাক আত্মাগুলো চীৎকার করছে। মোটকথা, এই মহামারী ছাড়বার বাতাসের কারণে এমন এক যুগ এসে গেছে যে, কোটি কোটি শ্বেত রোগগ্রস্ত, কোটি কোটি জন্মান্ধ, কোটি কোটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত এবং কোটি কোটি পচা-গলা লাশ ধরাপৃষ্ঠে পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তাই আমি আবারও বলছি, এদের জন্য কি জীবন সঞ্চারকারী কোনো 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম'-এর মর্যাদাসম্পন্ন মহাপুরুষের আগমন কি আবশ্যকীয় ছিল না? যখন মসীহ্ সম্পৃক্ত (খ্রিষ্টীয়) দাজ্জাল এসে গেল তখন কি 'মসীহ্-ইবনে-মরিয়ম' রূপী মহাপুরুষ আবির্ভূত হতেন না?

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.)

ঈদুল আযহার খুতবা

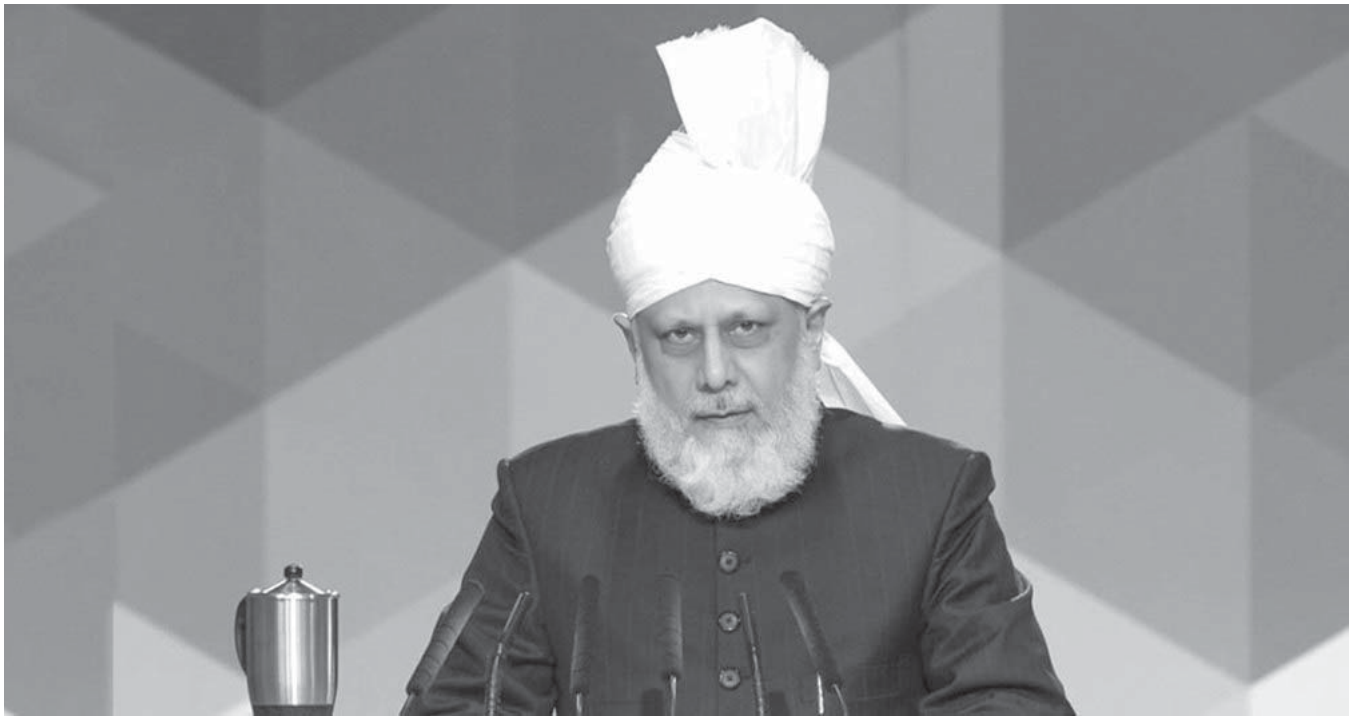

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৭'র ঈদুল আযহার খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ؕ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝٣٨

(সুরা আল হাজ্জ ৩৮)

এই আয়াতের অনুবাদ হল এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনা কর। কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও।

এই আয়াত কুরবানীর বিষয়বস্তু সম্পর্কীত একটি আয়াত আর হজ্জ সম্পর্কীয় আয়াতের সাথে এই আয়াতকে রাখা হয়েছে। মুসলমানদের জন্য এই আদেশ রয়েছে যে যাদেরকে আল্লাহ তা'লা তৌফিক দিয়েছেন তারা হজ্জে যাক বা না যাক, কুরবানী করার তৌফিক লাভ করার কারনে তারা যেন এই দিনগুলোতে অবশ্যই পশু কুরবানী করে। অতএব এ কারনেই কোটি কোটি মুসলমান ঈদুল আযহায় যা হজ্জ এবং হযরত ইবরাহিম ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর কুরবানীর বরাতে পালন করা হয়, এতে তারা পশু কুরবানী করে। কিন্তু শুধু পশু কুরবানীর মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর নিকট গৃহিত হতে পারে না বরং আল্লাহ তা'লা এই আয়াতে এই বিষয়টি বর্ননা করেছেন এবং মোমেনদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষন

করেছেন যে প্রকৃত বিষয় হল তোমাদের হৃদয়ের পবিত্রতা এবং তাকওয়া, যার মুল্য আল্লাহর নিকট রয়েছে।

সুতরাং কোন মোমেন যেন একারনে আনন্দিত না হয় যে আমি ঈদে অনেক মোটা এবং অনেক দামী পশু কুরবানী করেছি। যদি তাকওয়া না থাকে এবং কুরবানী যদি তোমার হৃদয়ে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে না পারে তাহলে তোমরা যতই মোটা এবং দামী পশু কুরবানী কর না কেন তা আল্লাহ তা'লার দৃষ্টিতে বৃথা। এই বিষয়টির হিকমত এবং এর গভীরতা এবং এর ব্যাখ্যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বর্ননা করেছেন। যাই হোক আমি এ বিষয়ে তাঁর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। ইসলাম সেই বিষয়ের নাম যা নিজের আত্মাকে পরিপুর্ন আধ্যাত্মিক খাদ্যের সহিত খোদার সম্মুখে রেখে দেওয়া অথবা নিজেকে জবাই বা কুরবানীর জন্য উপস্থাপন করা। এ বিষয়টি বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এই মর্যাদা খোদা তা'লার পরিপুর্ন মা'রেফাতের পরই অর্জিত হয় আর পরিপুর্ন মা'রেফাত কিভাবে অর্জিত হয় সেই বিষয়ে তিনি বলেন, ভয়, ভালোবাসা এবং সম্মানের মূল হচ্ছে পরিপুর্ন মা'রেফাত। তাই যাকে পুর্ন মা'রেফাত দেওয়া হয়েছে তাকে ভয় ও ভালোবাসাও পুর্নভাবে দেওয়া হয়েছে। আর যাকে পরিপুর্ন ভয় ও ভালোবাসা দেওয়া হয়েছে তাকে সেই সমস্ত পাপ থেকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে যা অজান্তেই সৃষ্টি হয়ে যায়। অতএব আল্লাহর ভালোবাসা তার ভয় এবং তার মর্যাদা এবং তাঁর সত্তার পরিচয়ই মারেফাত সৃষ্টি করে এবং যখন এই মা'রেফাত সৃষ্টি হয়ে যায় তখন মানুষ সকল পাপ থেকে বিরত থাকে। আর তিনি (আ.) বলেন, তারপর মানুষ পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে কেননা তারা খোদা তা'লার সত্ত্বার সঠিক জ্ঞান এবং তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়।

তিনি বলেন অতএব আমরা মুক্তির জন্য না কোন রক্তের মুখাপেক্ষী ,না কোন ক্রুশের মুখাপেক্ষী আর না আমাদের কোন প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন রয়েছে বরং শুধুমাত্র একটি কুরবানির মুখাপেক্ষী যা আমাদের নফসের কুরবানি। যার প্রয়োজনীয়তা আমাদের সত্তা অনুভব করছে। এমন কুরবানিরই অপর নাম হল ইসলাম। নফসের কুরবানির মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত মুসলমান হয়। তিনি বলেন, ইসলাম অর্থ হল জবাই হওয়ার জন্য নিজের মাথা সামনে উপস্থাপন করা অর্থাৎ পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির সাথে নিজের আত্মাকে খোদাতালার সমীপে উপস্থাপন করা। তিনি বলেন যে, এই সুন্দর নাম সকল শরীয়তের কেন্দ্রবিন্দু এবং সকল বিধি-নিষেধের প্রাণ। জবাই হওয়ার জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে নিজেকে উপস্থাপন করা আর এর জন্য প্রয়োজন পরিপূর্ণ ভালোবাসাও প্রেম। সন্তুষ্টচিত্তে মানুষ তখনই নিজেকে সামনে উপস্থাপন করে অথবা কুরবানি তখনই দেওয়া যেতে পারে যখন ভালোবাসা ও প্রেম পরিপূর্ণ হয়। তিনি আরও বলেন, পরিপূর্ণ ভালোবাসা মা'রেফাতের দাবী রাখে। সুতরাং ইসলাম শব্দটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে যে প্রকৃত কুরবানির জন্য পরিপূর্ণ মা'রেফাত ও পরিপূর্ণ ভালবাসা ব্যতীত অন্য কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই।

এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে খোদা তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে বলেন, "লাই ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিই ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম" অর্থাৎ এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌঁছে। কুরবানি কি এটি যে তুমি আমাকে ভয় কর এবং আমার জন্য তাকওয়া অবলম্বন কর। সুতরাং এই সূক্ষ্ম বিষয়টি ও এই দর্শন আমাদের বোঝা উচিত। আল্লাহতালা এমন কোন ভয়ংকর সত্তা নয় যার জন্য তিনি বলছেন যে আমাকে ভয় কর। বা তিনি এতটা ভয়ংকর যে, তাকে ভয় করা উচিত। না বরং আল্লাহ তা'লার ভয় তো এরকম যা কোন গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক খারাপ হওয়ার ভয়ে করা হয়। যেমন যদি কোন শিশু তার মাকে ভয় পায় তাহলে তার এই ভয় এই জন্য নয় যে তার মা বিপদজনক। বরং মায়ের মত ভালোবাসা আর কোথাও পাওয়া যায় না বরং বাচ্চার সাথে মায়ের একটি বিশেষ সম্পর্ক থাকে যার কারণে সে তার অসন্তুষ্টি ও কষ্ট কামনা করতে পারে না। তার সকল কথা মান্য করে। মা-বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখে এমন বাচ্চারা বড় হয়েও চায় না যে তার মা-বাবা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হোক এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য সে সকল প্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে। জাগতিক ভালোবাসায় আমরা দেখছি যে, সাময়িক ভালোবাসায় মানুষ তার প্রেমাস্পদের জন্য বিভিন্ন ধরনের দাবি পূরণ করে থাকে। এ সকল সাময়িক প্রেম যার এক সময় শেষ রয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একসময় এ ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় কিন্তু খোদাতালার প্রতি ভালবাসা এমন যা ইহকাল এবং পরকালকে সুসজ্জিত করে।

সুতরাং খোদা তা'লার এই ভয় যা আল্লাহ তা'লা বলেছেন তা তোমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি কর। এটি খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসার কারণে এবং খোদা তা'লার সম্মান ও মর্যাদার কারণে। তিনি (আ.) বলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'লার মা'রেফাত অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার ভয় প্রকৃত ভয় না। এ কারণেই মানুষ অনেক গুনাহ করে থাকে যে, খোদাতালার মা'রেফাত সে লাভ করে নাই। ঠিক তদ্রুপ মৌখিকভাবে খোদা তা'লাকে ভালবাসার দাবি তো রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ সময় জাগতিক বিষয়াদির ভালোবাসা খোদা তা'লার ভালোবাসার উপরে বিজয় লাভ করে। এ কারণেই মানুষ জগতের সাময়িক লাভের জন্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে ভুলে যায়। তারপর আল্লাহ তা'লাকে সকল শক্তির আধার তো বলা হয় কিন্তু জাগতিক মালিকদের খুশি করার জন্য আল্লাহ তা'লার আদেশকে অনেক সময় অমান্য করা হয়। অধিকাংশ সময় মানুষের অভ্যাস এমন দৃঢ় হয়ে যায় যে সে

একেবারেই বেপরোয়া হয়ে কাজ করা শুরু করে দেয়। তার এটি চিন্তায়ও আসেনা যে এমন এক খোদা আছেন যিনি আমাকে দেখছেন এবং যার দৃষ্টি আমার উপর রয়েছে। সুতরাং তিনি (আ.) বলেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'লার পরিপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান রাখে সে তাঁর ভয় এবং তাঁর ভালোবাসার উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করে এবং তারা পুনরায় পাপে লিপ্ত হয় না।

তারা সেই সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র থাকে, তারা দিন রাত এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে যে , নিজের প্রেমাস্পদ কে কিভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, সর্বাবস্থায় তার আদেশ নিষেধ পালনের জন্য চেষ্টায় রত থাকে, পার্থিব বিষয়াবলীকে খোদা তা'লার আদেশ নিষেধের উপর প্রাধান্য দেয় না। আর এ কারণে যদি তার জীবন এবং তার আশা আকাঙ্খার কুরবানীও দিতে হয় তবুও সে কুণ্ঠাবোধ করে না। আর তিনি (আ) এই কুরবানীর নামই বলেছেন ইসলাম বা বয়াতের অঙ্গীকারে আমরা যা বলে থাকি যে ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিব। তাহলে ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রকৃত মান সেই সময় অর্জিত হয় যখন আল্লাহ তা'লার মর্যাদা, এবং তাঁর সত্তা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান অর্জিত হয়। আর এটিও প্রকাশ থাকে যে, যেভাবে তিনি (আ) বলেছেন, আত্মার কুরবানী এবং ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়ার যে অঙ্গীকার এটা যেন বাধ্য হয়ে বা মনের বিরদ্ধে জোরপূর্বক না হয়। বরং মনের খুশি এবং সন্তুষ্টির সাথে হয়। তিনি (আ) বলেন, আর এটি তখনই সৃষ্টি হয় যখন মানুষ খোদা তা'লার তাকওয়া অবলম্বনকারী হয়। এই বিষয়টি তিনি (আ.) তাঁর অন্যান্য পুস্তকেও বর্ণনা করেছেন।

এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন যে, আল্লাহ তা'লা ইসলামী শরীয়তের অনেক জরুরি আদেশ ও নিষেধ এর জন্য দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অতএব মানুষের জন্য এই আদেশ যে সে তার সকল শক্তির মাধ্যমে এবং পুর্ণ আত্মবিলীনতার সাথে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি হয়ে যায়। অতএব বাহ্যিক কুরবানী সমূহ এই অবস্থার জন্যই দৃষ্টান্ত বানানো হয়েছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এই কুরবানিই, যেভাবে কুরআনে করীমে বলা হয়েছে, "লাই ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিই ইয়ানালুহুত তাকওয়া মিনকুম"।

গরু, বকরী বা দুম্বা এসবের কুরবানী তো কেবল নমুনা মাত্র, এটি আত্মজিজ্ঞাসার জন্য যে, যেভাবে এই ছোট জিনিস সমূহ আমাদের জন্য কুরবানি হচ্ছে, আমরা সেগুলো কুরবানি করছি। আমরাও কি আল্লাহ তা'লার জন্য নিজেদের নাফসকে কুরবানী করতে পারি বা করার জন্য প্রস্তুত। অতএব এটি বাহ্যিক দৃষ্টান্ত যা মানুষের সামনে রাখা হয়েছে যেন সে নিজের আত্মবিশ্লেষন করতে থাকে। তিনি বলেন, অর্থ্যাৎ খোদা তা'লার কাছে তোমাদের কুরবানীর মাংস পৌছায়না আর রক্ত পৌছায় না। কিন্তু তোমাদের তাকওয়া তার কাছে পৌছে। অর্থ্যাৎ তাঁকে এতটুকু ভয় কর যেন তোমরা তাঁর পথে মৃত্যুবরনও কর আর যেরুপ ভাবে তোমরা নিজেদের হাতে কুরবানির পশু জবাই কর। একই ভাবে তোমরা খোদার পথে জবাই হয়ে যাও, যদি কারো তাকওয়ার মান এর থেকে কম হয় তাহলে তা এখনও ত্রুটি পূর্ণ। অতএব বাহ্যিক কুরবানি, বাহ্যিক নামায ও রোযা, এবং ইবাদতের হিকমত বর্ননা করতে গিয়ে বলেন এগুলো কেন রাখা হয়েছে। অন্যত্র তিনি এর বিষদবর্ণনা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, বাহ্যিক নামায এবং রোযার সাথে যদি নিষ্ঠা এবং সততা না থাকে তবে এর মাঝে কোন বৈশিষ্ট থাকে না। যোগি এবং সন্নাসিরাও নিজেদের অবস্থানে অনেক পরিশ্রম করে থাকে। প্রায়শ দেখা যায়, তাদের মাঝে অনেকে হাত ও শুকিয়ে ফেলে। যোগিদের এত বেশি অনুশীলন করতে হয় যে এক স্থানে একই অবস্থায় নিজের হাত রাখে তো দিনের পর দিন , মাসের পর মাস সেখানেই রাখে। তার হাত শুকিয়ে যায়। তিনি বলেন, আর অনেক পরিশ্রম করে এবং নিজেকে কষ্টের মাঝে ঠেলে দেয়। কিন্তু এই কষ্ট সাধনা তাকে কোন জ্যোতি দান করে না। কষ্ট তো আছে কিন্তু এতে করে সে কোন জ্যোতি লাভ করে না এবং কোন সুখ বা প্রশান্তিও পায় না। বরং তাদের অভ্যন্তরিন অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তারা দৈহিক পরিশ্রম করে যা হৃদয়ের সাথে কম সম্পর্ক রাখে এবং আধ্যাত্মিকতার উপর এর কোন প্রভাব পরে না। এই অনুশীলন, এই প্রচেষ্টা, এই পরিশ্রম করার ফলেও তাদের নিজেদের মাঝে কোন আধ্যাত্মিক প্রভাব পরে না।

তিনি বলেন, এই জন্য কুরআনে শরীফে আল্লাহ তা'লা বলেন, "লাই ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিই ইয়ানালুহুত তাকওয়া"। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার নিকটে তোমাদের কুরবানির মাংস এবং রক্ত পৌছায় না বরং তাকওয়া পৌছায় এবং প্রকৃত পক্ষে খোদা তা'লা খোসাকে পছন্দ করেন না বরং তিনি সারকে (মগজ) চান। শুধুমাত্র বাহ্যিক খোসা বা চাকচিক্যের প্রয়োজন নেই বরং আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত সারবস্তু (মগজ) চান। তিনি বলেন যে, এখন প্রশ্ন এটি যে, যদি মাংস ও রক্ত না পৌছায় বরং তাকওয়া পৌছে থাকে তাহলে কুরবানি করার কি প্রয়োজন। আর এভাবেই নামাজ রোজা যদি আত্মার জন্য হয় তাহলে বাহ্যিকতার কি প্রয়োজন। (নামাজ পড়ার ও রোজা রাখার কি প্রয়োজন। আত্মার মাঝে শুধুমাত্র এক প্রকার আবেগ সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা আল্লাহ তা'লার সামনে ঝুকি হৃদয়ে এই ধারনা থাকাই যথেষ্ট)।

তিনি বলেন যে, এর উত্তর এটিই যে, এটি পাকা কথা যে, যে ব্যক্তি দেহ থেকে সেবা গ্রহন করা ছেরে দেয় তার হৃদয় এটি মানে না আর তার মাঝে সেই বিনয় ও দাসত্ব সৃষ্টি হতে পারে না। যদি দেহকে পরিশ্রমের মাঝে নিপতিত না কর, আত্মাকে দেহের সাথে পরিচালিত না কর বা দেহকে আত্মার সাথে পরিচালিত না কর তাহলে বিনয় ও দাসত্ব সৃষ্টি হতে

পারে না। এই অনুভূতি যদি সৃষ্টি না হয় যে, আমাদের প্রতিটি প্রয়োজনে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সামনে ঝুকবো, তার ইবাদত করবো, তার দাসত্ব অবলম্বন করবো আর তিনি বলেন যে, তাহলে সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিনয় ও দাসত্ব সৃষ্টি হতে পারে না। উদ্দেশ্য তো শারিরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার ইবাদতই, যেন বিনয় ও দাসত্ব সৃষ্টি হয়। আর যেন সর্বদা এই অনুভূতিই সৃষ্টি হয় যে, আমরা প্রতিটি প্রয়োজনে আল্লাহ্ তা'লার সামনেই ঝুকবো এবং তারই দাসত্ব অবলম্বন করবো আর তারই ইবাদত করবো। যদি এই দুটি বিষয় না থাকে তাহলে এটি সৃষ্টি হতে পারে না। আর যারা শুধু দেহ থেকে কাজ নেয় আর আত্মাকে তার মাঝে অংশিদার করে না সেও ভয়াবহ ভূলের মাঝে রয়েছে আর যোগিরা এধরনেরই। আল্লাহ্ তা'লা দেহ এবং আত্মার মাঝে একটি সম্পর্ক রেখেছেন এবং দেহের প্রভাব আত্মার উপর পরে থাকে। তিনি বলেন যে, শারিরিক এবং আধ্যাত্মিক সিলসিলাহ সমান ভাবে চলে। হৃদয়ে যখন বিনয় সৃষ্টি হয় তখন তা দেহেও সৃষ্টি হয়। একারণে যখন হৃদয়ে প্রকৃত ভাবে বিনয় এবং নম্রতা সৃষ্টি হয় তখন দেহের মাঝে নিজে নিজেই এর প্রভাব প্রকাশ পায়। আর এভাবেই দেহের মাঝে যখন কোন প্রভাব পরে তখন হৃদয়ও তা থেকে প্রভাবিত হয়।

সুতরাং এই দুটি বিষয় পরস্পর এক সাথে চলা প্রয়োজন। আর একজন মোমেনের জন্য এটিই নির্দেশ যে, তাকওয়া বৃদ্ধির জন্য বাহ্যিক ইবাদত ও কুরবানিও কর। এটি নিজ আত্মার উন্নতির জন্য কর, নিজ হৃদয় এবং নিজ প্রবৃত্তিকে পবিত্র করার জন্য কর। তাকওয়া কি যা চুড়ান্ত উদ্দেশ্য এবং যা আমাদের কুরবানি সমূহকে এবং ইবাদত সমূহকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটে গ্রহণযোগ্য করে তুলে। এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে তাঁর বিভিন্ন লিখনীতে ও বক্তৃতায় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এক স্থানে তিনি (আ.) তাকওয়ার শর্ত সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাকওয়াশীলদের জন্য এটি শর্ত যে, তারা নিজের জীবন দারিদ্রতা ও মিসকিনের ন্যায় অতিবাহিত করবে। এটি তাকওয়ার একটি শাখা যার মাধ্যমে আমদের অবৈধ ক্রোধের মোকাবিলা করতে হবে। বড় বড় প্রসিদ্ধ ব্যাক্তিগন ও সিদ্দিকগনের জন্যও সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়া। ক্রোধ সংবরণ করা এবং ক্রোধ থেকে বাঁচা অনেক বড় উদ্দেশ্য বরং বড় বড় প্রসিদ্ধ ব্যাক্তি ও সিদ্দিকদেরও এটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তিনি বলেন আত্বম্ভরিতা ও অহংকার ক্রোধ থেকে সৃষ্টি হয়। আত্বম্ভরিতা ও অহংকার ক্রোধের অবস্থায় সৃষ্টি হয় আর এভাবেই কখন কখন ক্রোধ নিজেই আত্বম্ভরিতা ও অহংকারের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। মানুষ রেগে যায় কেন ? এই জন্য যে, তার মাঝে কোন কোন অবস্থায় আত্বম্ভরিতা ও অহংকার পাওয়া যায়। সে অন্যকে নিজের থেকে নগন্য মনে করে এবং সে নিজেকে বড় মনে করে। আর সামান্য ভূলের জন্য রেগে যায়। এই কারণে তিনি বলেন, রাগ কখনও অহংকার এবং আত্বম্ভরিতা থেকে সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন যে, কেননা ক্রোধ তখনই হবে যখন মানুষ নিজের নাফসকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেয়।

অতএব যে সমস্ত লোকেরা দ্রুত রেগে যেয়ে ঝগড়ার দিকে অগ্রসর হয়ে যায় তাদের জন্য চিন্তার বিষয় হল, ঘরোয়া বিষয়ে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাগ প্রকাশ করে অথবা তার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাগ প্রদর্শন করে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাকে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং বিশেষ করে এই কুরবানির ঈদে এ বিষয়ের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত যে আমরা যেন আমাদের রাগকেও কুরবানী করি এবং নিজেদের নফসকে কুরবানি করে এটিকে উত্তম করুন। তিনি বলেন কেননা ক্রোধ সে সময় হবে যখন মানুষ নিজেকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়। তিনি বলেন আমি এটি চাই না যে আমার জামাতের লোকেরা নিজেদের মধ্যে একে অপরকে ছোট অথবা বড় মনে করুক অথবা একে অন্যের সাথে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করুক। অথবা হীন দৃষ্টিতে দেখুক। খোদা তা'লা জানেন বড় কে আর ছোট কে এটি এক ধরনের তুচ্ছ জ্ঞান করা। ভয় হলো যে এই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বীজের মতো বড় হয়ে তার ধ্বংসের কারণ না হয়ে যায়। কতক লোক বলেছেন অনেক মানুষ বড়দের সাথে অনেক আদবের সাথে এবং অনেক সম্মানের সাথে সাক্ষাত করে। কিন্তু বড় সে যে মিসকিনের কথা মিসকিনের ন্যায় শুনে এবং তার মনোস্তুষ্টি করে, তার কথার সন্মান করে এমন কোন কথা তার মুখ দিয়ে বের হয় না যার জন্য সে কষ্ট পায়।

খোদা তা'লা বলেন–

ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون

এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না ঈমানের পর পাপের দাগ লাগা অনেক মন্দ বিষয়। যারা তওবা করেনি তারাই হলো জালেম। তিনি বলেন একে অপরকে অসংযত নামে ডেকো না, এ কাজ ফাসেক এবং অসৎ লোকদের। যে ব্যক্তি কাউকে উত্ত্যক্ত করে সে ততক্ষণ পর্যন্ত মরবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এর মধ্যে নিপতিত হয়। তিনি বলেন নিজেদের ভাইদের তুচ্ছ জ্ঞান করো না যখন কিনা একই ঝর্ণা থেকে সবাই পানি পান করছো কে জানে যে কার ভাগ্যে বেশি পানি পান করা রয়েছে। জাগতিক নিয়মে কেউ সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয় না। খোদাতালার নিকট বড় সে যে মুত্তাকী।

ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير

তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে সম্মানিত আল্লাহ তা'লার নিকট সে ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকী , নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী এবং সকল বিষয়ে অবগত। পুনরায় একথা বলতে গিয়ে বলেন

সত্যিকারের মা'রেফাত বিনয় এবং নম্রতা থেকেই আসে এ কারণে মানুষকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিনয়ের সাথে খোদা তা'লার সমীপে অবনত হওয়া উচিত এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। তিনি বলেন, আমার নিকট পবিত্র হওয়ার উত্তম পদ্ধতি এটি। আর এটি সম্ভব নয় যে এর চেয়ে উত্তম কোন পদ্ধতি মানুষ লাভ করতে পারে যে মানুষ কোন প্রকার অহংকার এবং দাম্ভিকতা করবে না। জ্ঞান গত দিক দিয়েও না বংশের দিক দিয়েও না এবং অর্থের দিক দিয়েও না। আল্লাহ তা'লা যখন কাউকে চোখ দান করেন তখন সে দেখতে পায়। প্রত্যেক প্রকার জ্যোতি যা এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দিতে পারে তা আকাশ থেকেই এসে থাকে। বাহ্যিক চোখ দিয়েও আমরা তখনই দেখতে পাই যখন আলো পাওয়া যায় আর এই আলো আকাশ হতে আসে এবং মানুষ সর্বাবস্থায় এই ঐশী আলোর মুখাপেক্ষী। হোক সেটা আধ্যাত্মিক আলো বা জাগতিক আলো। তিনি বলেন চোখও ততক্ষণ পর্যন্ত দেখতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সূর্য থেকে আলো আসে যা আকাশ থেকেই এসে থাকে।

অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীন জ্যোতি যা প্রত্যেক অন্ধকার দূরীভূত করে, যা হৃদয়ের জ্যোতি যা হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভুত করে এবং এর পরিবর্তে তাকওয়া এবং পবিত্রতার নূর সৃষ্টি করে হৃদয়ের অন্ধকারকে দূরীভূত করে এবং সেই জ্যোতি এমনই যা তাকওয়া এবং পবিত্রতার জ্যোতি এবং হৃদয়ে তাকওয়া এবং পবিত্রতা সৃষ্টি করে সেটিও আকাশ হতে আসে। তিনি বলেন আমি সত্য সত্য বলছি যে মানুষের তাকওয়া, ঈমান, ইবাদত, পবিত্রতা সবকিছুই আকাশ হতে আসে।

এটি খোদা তালার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, তিনি যদি চান তাহলে তা প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর তিনি যদি না চান তাহলে তা দূর করে দেন। অতএব তিনি বলেন, সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান তারই নাম যে, মানুষ যেন তার সত্ত্বাকে ধৃত ও তুচ্ছ মনে করে। নিজেকে যেন কোন কিছু মনে না করে। বিনয় ও নম্রতার সাথে খোদা তা'লার দরবারে মাথা অবনত করে খোদা তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করে এবং সেই মা'রেফাতের জ্যোতি যাচনা করুন যা আত্মার আবেগ অনুভুতিকে নিঃশেষ করে। সুতরাং আত্মার আবেগ অনুভুতিকে নিঃশেষ করা যদি এটি হয় তাহলে আল্লাহ তা'লার কাছ থেকে এই মা'রেফাতের জ্যোতি যাচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। আর তা আল্লাহ ত'লার অনুগ্রহেই লাভ হয়ে থাকে।

তিনি বলেন, হৃদয়ে এক ধরণের আলো এবং পূন্য কাজ করার জন্য শক্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে। তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি লাভ হলে আত্মার কামনা বসনাকেও নিঃশেষ করবে এবং আলো ও পূন্যকর্মের জন্য হৃদয়ে এক প্রকার শক্তি ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবে। আর যদি তার অনগ্রহ থেকে সে কোন অংশ পায় এবং কোন সময় কোন ধরণের স্বাচ্ছন্দ ও হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যায়, যখন খোদা তা'লার এই অনুগ্রহ হবে আর হৃদয়সমূহ নূর দ্বারা পরিপূর্ন হয়ে যাবে তখন গর্ব করবে না বরং বিনয় ও নম্রতার মাঝে যেন আরো উন্নতি হয়। মানুষের হৃদয় যতই পরিষ্কার হতে থাকে তার মধ্যে নম্রতা ও বিনয় বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। কেননা সে নিজেকে যতটা তুচ্ছ মনে করবে ততটাই জ্যোতি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ন হবে যা তাকে অলো ও শক্তি প্রদান করবে। আর মানুষ যদি এই বিশ্বাস রাখে তাহলে আশা করা যায় যে আল্লাহ তালার অনুগ্রহে তার চারিত্রিক অবস্থা উত্তম হয়ে যাবে। এই পৃথিবীতে নিজেকে কিছু মনে করাও অহংকার এবং মানুষের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে সে অন্যদের প্রতি লানত করে এবং তাদের তুচ্ছ মনে করে।

তিনি বলেন, আমি এই সব কথা বার বার এ কারনে বলি যে, খোদা তা'লা এই জামাতকে যা বানাতে চেয়েছেন এর মধ্যে এটিই উদ্দেশ্য রয়েছে যে, সেই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যা পৃথিবী থেকে উঠে গেছে এবং সেই প্রকৃত তাকওয়া ও পবিত্রতা যা এই যুগে পাওয়াই যায় না তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, "সাধারণত পৃথিবীতে অহংকার ছড়িয়ে পড়েছে। আলেমরা নিজেদের জ্ঞানের পান্ডিত্য এবং অহংকার প্রদর্শনে নিমজ্জিত রয়েছে। দরিদ্রদের দেখ, তাদের অবস্থা অন্যরকম। তাদের নফসের সংশোধনের প্রতি ভ্রুক্ষেপই নেই। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যিকতা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। তাই তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সাধনাও অন্য ধরণের। যেরুপভাবে, যিকর আররাহ প্রভৃতি যাদের নবুয়্যতের ঝর্ণাধারার সাথে কোন সম্পর্কই নেই। আজকাল বিভিন্ন ধরণের লোকেরা বিভিন্ন ধরণের যিকর বানিয়ে নিয়েছে। নিজেদেরকে আলেমও মনে করে থাকে, সুফিও মনে করে থাকে। কিন্তু তিনি বলেন, এমন এমন বিদ'আত সৃষ্টি করেছে যা মুহাম্মদ (সা.) এর সত্তার সাথে দুরতম কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, আমি দেখছি, তাদের হৃদয়কে পবিত্র করার ব্যাপারে কোন মনোযোগই নেই। শুধু বস্তুবাদীতার মধ্যেই তারা নিমজ্জিত। তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার লেশমাত্রই নেই। এই চেষ্টা প্রচেষ্টা হৃদয়কে পবিত্র করতে পারে না আর তত্ত্বজ্ঞানের নূরের ছিটেফোটাও দিতে পারে না।

সুতরাং এই যুগ সম্পূর্ণ খালি। নবুয়্যতের পদ্ধতিতে যেমনটি করার ছিল তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং ভূলে যাওয়া হয়েছে। এখন আল্লাহ তা'লা চান যেন সেই নবুয়্যতের যুগ পুনরায় ফিরে আসে এবং তাকওয়া ও পবিত্রতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় আর তিনি একে এই জামাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সুতরাং জামাতের সদস্যদের উপর অনেক বড় দায়িত্ব ন্যাস্ত যে, তারা যেন নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে যার প্রত্যাশা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে করেছেন। অতএব তিনি বলেন, তোমাদের জন্য আবশ্যক যে, তোমরা প্রকৃত সংশোধনের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ কর। ঠিক সেভাবে যেভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

সংশোধনের পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। জামাতকে তাকওয়ার উপর চলার জন্য নসীহত করতে গিয়ে অন্যত্র তিনি বলেন, "অতএব যারা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলে পরিচয় দিয়ে থাক, একথা নিশ্চয় জেনো যে আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার শিষ্যমণ্ডলী বলে পরিগণিত হবে, যখন তোমরা সত্য সত্যই ধর্ম নিষ্ঠার পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ বেলার নামায এরুপ ভীতি সহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে পড়বে যেন তোমরা আল্লাহ তা'লাকে সাক্ষাৎভাবে দেখছ। তোমাদের রোযাও নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। তোমাদের মধ্যে যারা যাকাত দেওয়ার উপযুক্ত তারা অবশ্য যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ অবশ্য কর্তব্য এবং তা পালনে কোন বাধা নেই, তারা অবশ্য হজ্জ করবে। সকল পুণ্য কাজ সুচারুরুপে সম্পন্ন করবে এবং সকল পাপকে ঘৃনার সাথে পরিহার করবে।

এ কথা নিশ্চয় জানবে যে, কোন ধর্ম আল্লাহর নিকট গৃহীত হবে না যাতে প্রকৃত তাকওয়া নেই। এ তাকওয়াই সকল পুণ্যের মূল। যে কর্মে এ মূল ধ্বংস হয় না, সে কর্ম কখনো ধ্বংস হবে না"। হাদিসও রয়েছে 'ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত', সমস্ত কাজের ভিত্তি নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি নেক নিয়তের মাধ্যমে এই কাজ হয় তাহলে আল্লাহ তা'লা এর প্রতিদান দিয়ে থাকেন আর যদি নিয়ত খারাপ হয় তাহলে শাস্তি রয়েছে। তিনি বলেন, এটি আবশ্যক যে নানা ধরণের দুঃখ, কষ্ট, বিপদাপদের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে যেভাবে মুমিনদের পরীক্ষার সময় পথিমধ্যে বিপদাবলি এসে থাকে। সুতরাং সাবধান হও এমন যেন না হয় যে হোচট খাও। পৃথিবী তোমাদের কিছুই করতে পারবে না যদি আকাশের সাথে তোমাদের দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। তোমাদের ক্ষতি তোমাদের হস্ত দ্বারাই সাধিত হতে পারে শত্রুর হস্ত দ্বারা নয়। তোমাদের সমস্ত পার্থিব সম্মান যদি ধ্বংস হয় তবে আল্লাহ তা'লা তোমাদেরকে আকাশে এক অক্ষয় সম্মান দিবেন। সুতরাং তোমরা কখনই তাঁকে পরিত্যাগ কর না, সর্বদা তার সাথে আবদ্ধ থাক। তিনি বলেন, দেখ! আমি তোমাদের অত্যন্ত খুশির সাথে এই সংবাদ দিচ্ছি যে, তোমাদের খোদা অবশ্যই বিদ্যমান রয়েছেন। যদিও সবাই তারই সৃষ্ট, কিন্তু তিনি সেই ব্যক্তিকে বেছে নেন যে তাকে বেছে নেয়। তিনি তার নিকটে আসে যে তার নিকটে আসে। যে তাকে সম্মান করে তিনি তাকেও সম্মান করেন। অতএব, আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখ, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মানও দিবেন এবং তোমাদের কাছেও আসবেন এবং তোমাদের দোয়াসমূহকেও কবুল করবেন। এটি তিনি আমাদেরকে বলছেন।

সুতরাং এটি সেই অবস্থা যাকে অর্জন করার জন্য আমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিৎ যেন আমরা আল্লাহর সুরক্ষায় আসতে পারি এবং আকাশের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টিকারী হতে পারি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তার এক ইলহামে অনেক দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়ে তার জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, তাকওয়ার মানকে উন্নত করার জন্য তিনি বলেন, "কাল অর্থাৎ ২২ জুন ১৮৯৯ সালে অনেক বার আমার প্রতি খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম করা হয়েছে যে, তোমরা মুত্তাকি হয়ে যাও এবং তাকওয়ার সুক্ষ্ম রাস্তায় চল, তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের সাথে থাকবেন। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে আমার হৃদয়ে অনেক ব্যাথা সৃষ্টি হয় যে, আমি কি করব যাতে করে আমার জামাত সত্যিকারের তাকওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করবে। অতঃপর বলেন, আমি এত দোয়া করি যে, দোয়া করতে করতে আমি দৈহিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ি। অনেক সময় বেহুশ হয়ে পড়ি এবং নিঃশ্বেষ হয়ে যাই। তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জামাত খোদার তা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকি না হবে ততক্ষন তারা খোদা তা'লার সাহায্যের অংশীদার হতে পারবে না। সুতরাং আমাদের এদিকে গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয়কে অনুভব করে সত্যিকার তাকওয়াকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দিন।

আমাদের ইবাদত, আমাদের কুরবানি শুধুমাত্র যেন আল্লাহর জন্যই হয়। আমরা যেন প্রকৃত মা'রেফাত অর্জনকারী হতে পারি। আল্লাহর প্রতি ভালবাসার অধিকার আদায়কারী হতে পারি। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে আসীরানে রাহে মাওলাদের স্বরণ রাখবেন তারা খোদার খাতিরে বন্দী জীবন যাপন করছেন। ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়ার কারণে তাদেরকে এই ধরণের কুরবানি দিতে হচ্ছে। আল্লাহ ত'লা অতি দ্রুত তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। যারা জামাতের জন্য মামলা-মোকাদ্দমায় জর্জরিত তাদেরকেও এই সমস্ত মোকাদ্দমা থেকে মুক্তি দিন। পাকিস্তান ও আলজাযায়ের এবং পৃথিবীর সেই সমস্ত দেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন যারা আহমদীয়াতের কারণে কোন না কোন বিপদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছেন। জামাতের সার্বিক উন্নতি ও তাকওয়ার মানদন্ড উন্নতির জন্য অনেক দোয়া করুন। মুসলিম উম্মাহর জন্যও দোয়া করুন যেন আল্লাহ তা'লা তাদেরকে বিবেক বুদ্ধি দান করেন এবং তাকওয়ার প্রকৃত অর্থ এবং হজ্জ ও কুরবানির প্রকৃত তত্ত্বকে অনুধাবনের মাধ্যমে যুগ ইমামের বয়াতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যায়। এখন দোয়া করুন। এখন ১ মিনিট অপেক্ষা করুন। খুতবা সানীয়ার পর দোয়া হবে।

খুতবা সানীয়া।

সকলকে ইদ মোবারক। আসসলামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

ভাষান্তর: **নাবিদ আহমদ লিমন**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

‘জ্ঞানই হচ্ছে তবলীগের উপায়’

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, ইউ, কে-এর ২০১৮ সনের মজলিস শুরায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ

২৩ জুন, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ইউ, কে-এর মজলিস শুরায় নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা ও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ঈমানোদ্দীপক এক ভাষণ দান করেন। মজলিস শূরা প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান পরামর্শক সংস্থা, যা খাঁটি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা প্রচারে বিভিন্ন প্রস্তাবের ওপর আলোচনা ও এর কর্ম সম্প্রসারণের নিমিত্তে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি ও আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ এ শূরায় উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে হুযূর (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণটির পুরো প্রতিলিপি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

তাশাহুদ, তাউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন: “আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহে আমাদের জামাতের মাঝে মজলিসে শূরার প্রতিষ্ঠানটি সুপ্রতিষ্ঠিত আছে আর সেসব দেশে এটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে এক দীর্ঘকাল ধরে নিজামে জামাত (আহমদীয়া জামাতের প্রশাসনিক কাঠামো) প্রতিষ্ঠিত আছে। আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহে যেভাবে আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, ইউ কে জামাতটি হচ্ছে প্রাথমিক যুগের প্রতিষ্ঠিত জামাতগুলোর অন্যতম, আর তাই মজলিস শূরার এক দীর্ঘ ইতিহাস এ দেশেও রয়েছে এবং ইউ. কে-তে খিলাফতে আহমদীয়া হিজরত করার ফলে ইউ. কে জামাতের সদস্যবৃন্দ মজলিসে শূরার বিশাল গুরুত্ব ও এর মূল্য স্পষ্টভাবে বুঝে থাকেন।

খলীফাতুল মসীহ্‌র সরাসরি উপস্থিতির কারণে ইউ. কে জামাতটি বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ অথবা জরুরী যে কোন বিষয়ে সারা বছরই খলীফায়ে ওয়াক্ত-এর প্রত্যক্ষ হেদায়াত ও নির্দেশগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পেয়ে থাকে। যাহোক, তা সত্ত্বেও এবং জামাতের সুবিধার্থে উপযুক্ত যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে খলীফায়ে ওয়াক্তের অবাধ-ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জরুরী বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী প্রণয়নে আলোচনা ও পরামর্শের জন্য জামাতের সদস্যদেরকে তিনি মজলিসে শূরায় যোগদান করার নির্দেশ দান করেন। এরপর মজলিসে শূরা কর্তৃক সেসব পরামর্শ সযত্নে বিশ্লেষণ করা হয় এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই আলোচনার জন্য সুন্দরতর দফাগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়। অধিকন্তু, আমি এ কারণে আনন্দিত যে, আল্লাহ্ তা’লার অনুগ্রহে এখানে উপস্থিত আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, শূরার সদস্য হিসেবে আপনাদের ভূমিকাটি হচ্ছে উপদেশমূলক এক মতামত প্রদান করা। আর আপনারা এটিও জানেন যে, মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কোন একটি প্রতিষ্ঠান নয়। তথাপি, উপদেশক এক সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকাও আপনাদের পালন করার আছে, আর তাই আপনাদের সেসব দায়িত্ব সম্পর্কে আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং সেগুলোকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করুন। যেকোন বিষয়ে যুক্তি-পরামর্শ অথবা আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে সে বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের উচিত সতর্কতার সাথে চিন্তা করা এবং তারপর আপনাদের মতামত উপস্থাপন করা।

এ কথাটিও আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, উক্ত বিষয় সম্পর্কে অন্যান্যদেরও ভিন্ন অভিমত থাকতে পারে যেগুলো অকপট এবং সমভাবেই যুক্তিসিদ্ধ। অতএব, আপনাদের উচিত অন্যদের মতামত প্রকাশের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং কখনোই এ চিন্তা না করা যে, কেবল আপনার অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য। বস্তুত শূরার সদস্য হিসেবে আপনাদের উচিত পরম বিনয়ের সাথে কাজ করা এবং কখনো এই চিন্তা না করা যে, আপনার অভিমতটি অন্যদের অভিমতের চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বিনয়ের এমন এক স্পৃহাই এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করবে যে, শূরাটি পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক পরিবেশে পরিচালিত হচ্ছে এবং এটা মতামত বিনিময় ও বিতর্কের উচ্চতর ইতিবাচক মান বজায়

রেখেছে। এটি এ বিষয়টিকেও নিশ্চিত করবে যে, মতামত অথবা সুপারিশ যা-ই এসেছে, তা খুবই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকন্তু, আপনাদের সবারই এটা বুঝা উচিত যে, দোয়ার মাধ্যমে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া ব্যতীত আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। তাই কোন চাঁদা প্রদান অথবা শূরায় অংশ গ্রহণের পূর্বে আপনারা অবশ্যই আন্তরিকভাবে এ দোয়া করবেন যেন আল্লাহ্ আপনাদেরকে উত্তম পথে পরিচালিত করেন। আপনারা যদি কেবল তাকওয়া অবলম্বন করেন আর যদি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করেন, তবেই আপনাদের ওপর অর্পিত যে দায়িত্ব, তা পালনের অবস্থায় আপনারা থাকবেন। শূরার প্রত্যেক সদস্যকে এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তাক্ওয়া (খোদাভীরুতা) অবলম্বন করা ছাড়া কোন কিছুই অর্জন করা যায় না, আর কোন বিতর্ক অথবা আলোচনাই তাকওয়া ছাড়া প্রলপ্রসূ হবে না। তাকওয়া অর্জনে আপনার অন্তরে সর্বদাই খোদার নিরবচ্ছিন্ন ভয় আর এ বোধ থাকতে হবে যে, ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করা ছাড়া কোন কিছুই অর্জন করা যেতে পারে না এবং কোন বিতর্ক অথবা আলোচনাই তাকওয়া ছাড়া ফলপ্রসূ হবে না। তাকওয়া অর্জনে আপনার অন্তরে সর্বদাই খোদার নিরবচ্ছিন্ন ভয় আর এ বোধটি থাকতে হবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপনার অন্তরের প্রত্যেকটি চিন্তা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত আছেন। আপনার অভিমতটি জনমতের সঠিক প্রতিফলন কি-না, অথবা, তাতে কোনরূপ কায়েমী স্বার্থ জড়িত আছে কি-না, তা তিনি (আল্লাহ্) সবিশেষ অবগত আছেন।

শূরার সার্বিক কর্মসূচীটিতে তবলীগ (প্রচার ও প্রসার), তরবিয়ত (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ) এবং অন্য অনেক বিষয়েই আলোচনা হয়ে থাকে আর সেসব বিষয়ে ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা কি, তাও চাওয়া হয়। একইভাবে, প্রশাসনিক অন্যান্য বিষয় অথবা প্রস্তাবও আলোচিত হয়ে থাকে। আলোচ্য বিষয়সূচী যদিও প্রতিবছরই পরিবর্তিত হয়ে থাকে, তথাপি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা বিশেষভাবে চিন্তা করার জন্যে শূরায় উপস্থাপন করা হয়, তা হচ্ছে– ইউ কে জামাতের বার্ষিক বাজেট। আগামী বছরের প্রত্যাশিত আয় ও ব্যয়-এর উভয়টিই বিশ্লেষণ করা হয় এবং জামাতের ভবিষ্যৎ বাজেটটি কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং সংগৃহীত কোন তহবিল, যে কোন অংকেরই হোক না কেন, কতটা উত্তমভাবে তা কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করা হয়। সর্বদা স্মরণ রাখবেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বাজেট, তা জাগতিক কিংবা বস্তুগত কোন উপায়ে সংগ্রহ করা হয় না। জামাতটির হাতে যে অর্থই থাকে, তা জাগতিক কোন প্রচেষ্টা অথবা মুনাফা অর্জনের কোন স্কীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এটা জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর ওপরই সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এভাবে জামাতের কর্মকর্তা অথবা সেসব লোক, যারা জামাতের অর্থ খরচ করে থাকে, তাদের সর্বদাই সেই মূলনীতিটি স্মরন রাখা উচিত, যা নিয়ে এ তহবিল সংগৃহীত হয়েছে।

আহমদীগণ প্রায়শঃই তাদের নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজনগুলোকে উপেক্ষা করে থাকে এবং এ কারণে নিজদেরকে অসুবিধায় ফেলে দেয়, যাতে জামাতের চাহিদাগুলো পূরণ করা যায়। আল্লাহ্‌র জামাতের খাতিরে আহমদীরা যদি এমন ঐকান্তিক কুরবানী করে এবং ব্যক্তিগত অসুবিধা সহ্য করে, তবে কর্মকর্তাগণ এবং সেসব ব্যক্তি যারা বাজেট প্রণয়ন করেন, তাদের উচিত এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে গভীর মনযোগ দেয়া যে, প্রতিটি মুদ্রাই চরম সতর্কতার সাথে খরচ করা হচ্ছে এবং তার হিসাবও যথাযথ ভাবে রাখা হচ্ছে। অধিকন্তু, এ বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া আপনাদের উচিত নয় যে, জামাতের অঢেল অর্থ রয়েছে। বরং আয় যা কিছু আছে এবং যা এর বিভিন্ন কর্মসূচী ও স্কীম প্রতিষ্ঠায় প্রদান করতে চাই, তার তুলনায় আয় খুবই সীমিত। ফলত: কোন বাজেট যখন তৈরী করা হয় অথবা কোন তহবিল যখন কাজে লাগানো হয়, তখন সর্বদাই 'কম খরচে অধিক সুবিধা লাভ'– এর অর্থনৈতিক মূলনীতিটি অনুসরণ করুন।

আমাদের জামাতের কাজগুলো সাধারণ কোন কাজ বা ছোট কোন কাজ নয়, বরং আমাদের উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে সুদূরপ্রসারী এবং সত্যিকার অর্থেই মহান। তথাপি, যেভাবে আমি বলেছি, জামাতের প্রাপ্য তহবিলটি সীমিতই হয়ে থাকে আর তাই আমাদের আশা ও আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি খাতের লক্ষ্য পূরণ করা অথবা প্রতিটি পরিকল্পনা যা মনে আসে, তা কার্যকর করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই, বাজেট যখন প্রস্তুত করা হয়, তখন আপনাদের উচিত বাস্তববাদী হওয়া এবং এটি নিশ্চিত করা যে, প্রত্যেকটি বিভাগকেই সামর্থ এবং স্ব স্ব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায্য হিস্যা প্রদান করা হয়েছে।

প্রত্যেকটি বিভাগই তাদের নিজস্ব ধরণ অনুযায়ী– যেহেতু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমি এ বিষয়টি পরিস্কার করতে চাই যে, তবলীগ বিভাগের কাজটি হচ্ছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমার খুতবা সমূহে যেভাবে অনেকবারই আমি বলেছি, কেবলমাত্র পবিত্র নবী (সা.) এর মাধ্যমেই পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী এক শিক্ষা এবং নিখুঁত এক শরীয়ত নাযেল হয়েছে। তারপর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর যুগটিই হচ্ছে সেই যুগ, যখন সংবাদ মাধ্যম এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির অন্যান্য উপায় আবির্ভাবের মাধ্যমে নিখুঁত সেই শিক্ষাটির, এর শীর্ষ-বিন্দুতে পৌঁছা নির্ধারিত ছিল। এভাবে আমরাই হচ্ছি সেসব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যারা মহিমান্বিত সেই যুগে বাস করছি, যার মধ্যে নিখুঁত ধর্ম ইসলামের বিস্তৃতি এর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছা নির্ধারিত, আর তাই আমাদের তবলীগি প্রচেষ্টাগুলো হচ্ছে আমাদের জামাতের সফলতা এবং উন্নতির মৌলিক বিষয়। এটা হচ্ছে এক ঐশী-প্রতিষ্ঠান, আর তাই কখনোই এটাকে হাল্কাভাবে গ্রহণ করবেন না। বার্তা প্রচারের বড় একটি মাধ্যম হচ্ছে সাহিত্য। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তার কিতাবাদির আকারে আমাদেরকে যে বিশাল এক ধনভান্ডার দান করে গেছেন, তা আমরা অবশ্যই প্রচার করবো এবং যতবেশী সম্ভব তা প্রসারিত করবো। উপরন্তু, তবলীগের অন্যসব উপায়-উপকরণ যা আমাদের হাতে রয়েছে, সেগুলো প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর কিতাবসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত হচ্ছে। উদারহরণ স্বরূপ, আমরা যেসব প্রচারপত্র প্রকাশ করে থাকি, সেগুলোর ভিত্তিও হচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর হেদায়াত ও লিখাসমূহ। একই ভাবে, আমাদের তবলীগি কার্যক্রম, ধর্মীয় সম্মেলন অথবা আলোচনা সভাগুলোও হয়ে থাকে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা সমূহের ভিত্তিতেই, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) দান করে গেছেন। ফলত এটি একান্তভাবেই জরুরী একটি বিষয় যে, জামাতের সদস্যগণ তাদের নিজস্ব

পাঠাগারগুলো প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর কিতাবসমূহ দ্বারা গড়ে তুলবে, যাতে তার (আ.) বইগুলো বার বার পাঠ করার মাধ্যমে তারা অবিরতভাবেই তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে। নিশ্চয়ই প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং শুরার সদস্যের উচিত এ ব্যাপারে এক উদাহরণ সৃষ্টি করা। উর্দু অথবা ইংরেজী, যে ভাষাতেই আপনারা এগুলো পাঠ করুন না কেন, আপনাদের উচিত, লভ্য সবগুলো বই-ই পাঠ করা। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহে পতিত হবেন না যে, **'জ্ঞানই হচ্ছে তবলীগের উপায়'**। আপনারা যদি কেবল আপনাদের ধর্মকে বুঝেন, তবে অ-আহমদী ও অমুসলিমদের দ্বারা যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, সেগুলোর জবাব আপনারা যুক্তি সহকারে প্রদান করতে পারবেন। এটা আমার তীব্র এক আকাঙ্খা যে, জামাতের প্রত্যেক সদস্যই তবলীগের কাজে অন্তর্ভুক্ত হবে আর সেজন্য কিতাবাদি প্রকাশের কাজে মরকযের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বড় অংকের অর্থ খরচ হবে। ইউ.কে. জামাতের উচিত, এই সুবিধাটি গ্রহণ করা এবং অন্যান্য জামাতগুলোর উচিত অধিক সংখ্যায় এসব বই ক্রয় করা, যাতে জামাতের সদস্যগণ তাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে। এছাড়াও, **তবলীগি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আপনাদের উচিত বৃহত্তর সমাজের সদস্যদের কাছে পর্যাপ্ত সংখ্যক বই বিতরণ করা। জামাতের সেক্রেটারী ইশায়াত (প্রকাশনা), সেক্রেটারী তরবিয়ত এবং সেক্রেটারী তবলীগ– প্রত্যেকের উচিত এ বিষয়টিকে তাদের এক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পরস্পরকে সহযোগিতা করা**। যাহোক, একই সাথে সেক্রেটারী তবলীগকে এ বিষয়ে ভালভাবে অবগত হতে হবে যে, আমাদের জামাতের আর্থিক উৎসগুলো খুবই সীমিত, যেভাবে আমি ইতোমধ্যেই বলে দিয়েছি আর তাই **তবলীগ বিভাগের উচিত, যে তহবিলই তাদেরকে প্রদান করা হয় তা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায় করা। তবলীগ বিভাগের উচ্চাভিলাষ থাকা উচিত এমনকি অতি উচ্চাভিলাষী সব পরিকল্পনা রাখা উচিত, কিন্তু একই সময়ে তাদের উচিত এ বিষয়টিও নিশ্চিত করা যে, খরচ করার পালা যখন এসেছে, তখন প্রতিটি মুদ্রাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে খরচ করা হয়েছে**। দুঃখজনকভাবে বলতে হয় যে, আমেলার অভ্যন্তরে কখনো কখনো বিচারার্থ অথবা কলহের কোন বিষয় উত্থাপিত হয়। যে কোন ধরণের বিভ্রান্তি পরিহার করতে প্রত্যেক সেক্রেটারী, তা জাতীয় অথবা স্থনীয় পর্যায়েরই হোক না কেন, তার উচিত, জামাতের আইন ও বিধিগুলো সযত্নে অধ্যয়ন করা। তাদের স্ব স্ব বিভাগের উদ্দেশ্যগুলো কি, তা পরিস্কার ভাবে তাদের বুঝা উচিত এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্বগুলো কি, তাও জানা উচিত। তাদের উচিত নয় অন্যদের অধিকারসমূহে অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে চাওয়া, বরং তাদের উচিত, নিজ নিজ বিভাগের যে উদ্দেশ্য, তা পূরণে সজাগ থাকা। সেক্রেটারী তবলীগ-এর উচিত, তবলীগ এর কাজ সম্পাদনে সতর্ক থাকা। সেক্রেটার উমুরে খারেজার (বহির্বিষয়াদি) উচিত, বহির্বিষয়াদির কাজ সম্পাদনের ওপর জোর দেয়া আর সেক্রেটারী তরবিয়তের উচিত তরবিযতী বিষয়াদির ওপর দৃষ্টি রাখা আর এভাবে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের সেক্রেটারীগণের উচিত স্ব স্ব বিভাগের কাজের নিগরানী করা। **সেক্রেটারীগণ এবং তাদের বিভাগগুলো যদি নিজ নিজ কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারে, তবে তা অন্য বিভাগগুলোকে, বিশেষ করে তবলীগ বিভাগকে, প্রশ্নাতীতভাবেই সুবিধা দান করতে পারে।**

উদাহরণস্বরূপ, উমুরে খারেজা বিভাগটি যদি সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী অথবা অপরাপর বহি:সংস্থার লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে, তবে তা ইসলামের বার্তা প্রসারের দরজা আরো অধিকভাবে উন্মুক্ত করবে। একইভাবে, সেক্রেটারী তরবিয়ত যদি তার কাজ সঠিকভাবে করে, তবে তা এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে যে, তবলীগের কাজে অধিক সংখ্যক আহমদী নিযুক্ত আছে। ইশায়াত বিভাগও যদি এর প্রকাশনার কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করে, তবে সেটাও তবলীগের প্রচেষ্টায় সহায়তা করবে। তৎসত্ত্বেও, তবলীগের জন্যে প্রাথমিক যে দায়িত্ব, তা সেক্রেটারী তবলীগ-এর ওপরই বর্তায় আর তাই তিনি এবং তার টীমের উচিত, সে বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের বিভাগের সীমিত শক্তির মধ্যে থেকেই দায়িত্ব পালনে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। যেভাবে আমি বিষয়টি পরিস্কার করেছি যে, তবলীগ বিভাগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এটিকে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা দান করা উচিত, এ দ্বারা কিন্তু এটি বুঝায় না যে, তাদেরকে অলিখিত (ফাঁকা) একটি ব্যাংক-চেক (Blank Cheque) দেয়া উচিত অথবা তাদের যেকোন চাহিদাই পূরণ করা উচিত, বরং যেসব কারণ আমি উল্লেখ করছি, সে বিষয়ে তাদের উচ্চ-অগ্রাধিকারটি বিবেচনায় নেয়া উচিত। তবলীগ ও তরবিয়তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে সালানা জলসা (বার্ষিক সম্মেলন), আর ইউ কে-র সালানা জলসা অনুষ্ঠিত করতে যে অর্থ খরচ হয়, তা গুরুত্বপূর্ণ এবং চান্দা জলসা সালানার মাধ্যমে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, খরচ তা থেকে বহুগুণ বেড়ে যায়। বস্তুত ইউ. কে-র সালানা জলসার অনুষ্ঠানে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, তার তিন ভাগের এক অংশই বহন করে আন্তর্জাতিক মরকজ। কারণ, ইউ কে-র জলসাটিকে আন্তর্জাতিক জলসা হিসেবে গণ্য করা হয় আর এর প্রভাবটিও হয়ে থাকে আন্তর্জাতিক।

আরেকটি বিষয় যা আমি পরিস্কার করতে চাই তা হচ্ছে– অর্থ কমিটি, বাজেট কমিটি অথবা মজলিস শূরার উচিত নয় বিশেষ কোন বিভাগের জন্যে অকারণে কোন অধিক বাজেটের অনুমতি দেয়া। প্রত্যেক বিভাগের জন্যে যে বাজেট, তা তাদের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত আর **প্রত্যেক সেক্রেটারীর এটি নিশ্চিত করা এক দায়িত্ব যে, যে তহবিলই তাদেরকে বন্টন করা হয়, তা দ্বারা সর্বোচ্চ যে সুবিধা তা তাদের লাভ হয়েছে এবং তাদের খরচ যতবেশী সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। খুঁটিনাটি এসব বিষয়ে প্রত্যেক বিভাগই যদি সতর্কতার সাথে কাজ করে তবে ইনশাআল্লাহ্, তারা সমৃদ্ধ হবে এবং তাদের প্রয়োজনাদি মেটাতে পারবে।**

অধিকন্তু, এটা আমার গভীর এক অনুভূতি যে, বাজেটের ব্যবস্থাপনা অথবা এর বন্টন-পদ্ধতির ওপর কতিপয় সেক্রেটারী অবিচারের এক ধারণা পোষণ করে থাকে। সম্ভবত তারা মনে করে যে, কতিপয় বিভাগের প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ করা হয়েছে। কতিপয় লোক এ বিষয়ে তাদের এ উদ্বেগও প্রকাশ করেছে যে, উমুরে খারেজা বিভাগ তাদের প্রয়োজনের অধিক এক বাজেট পেয়েছে। তাদের কাজে সঠিক কত ব্যয় হয়েছে অথবা তাদের খরচের সামগ্রিক ফল যে কি, তা আমি জানি না। যেভাবেই হোক, আমি এটার পুনরাবৃত্তি করছি যে, উমুরে খারেজা বিভাগ এবং অন্যান্য সব বিভাগেরই

উচিত তাদের খরচ যতটুকু সম্ভব কমানো এবং প্রতিটি মুদ্রাই ফলপ্রসূ কায়দায় খরচ করা। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, বাজেটগুলো যদি সে পন্থায় তৈরী করা হয় যেভাবে আমি উল্লেখ করেছি, তাহলে এ ধরণের যেকোন অসুবিধাই দূর হয়ে যাবে।

বাজেট সম্পর্কিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি তবলীগ সম্পর্কেও আমি আরেকটি জরুরী বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। ইসলামের বার্তা প্রসারে সাম্প্রতিক যে অভিযান, সে সম্পর্কে জামাতের কোন কোন সদস্য ও কর্মকর্তার নিজস্ব মানোভাব থেকে থাকবে। তাদের এক অভিমত হচ্ছে এই যে, মানুষকে কেবল এটি বলাই যথেষ্ট হবে "ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে"– এর বেশী আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, সেটিকে ঝুঁকিগ্রস্ত করা, যা উচিত নয়। তাদের এ মনোভাবটি সম্পূর্ণরূপেই ভুল। এর একটি অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে– বিগত কয়েক মাস ধরে তবলীগ বিভাগ 'মসীহ্ এসে গেছেন'–শিরোনামে এক অভিযান চালু করেছে এবং কয়েকটি শহরে এ বিজ্ঞাপনটি প্রদর্শন করেছে। সামাজিক মাধ্যমগুলোতেও তারা এ অভিযান চালিয়েছে। যা হোক, কতিপয় কর্মকর্তা তাদের নিজস্ব এ ধারণা পোষণ করেছে যে, এ অভিযানটি আমাদের বিদ্যমান সম্পর্কের ক্ষতিসাধন করবে, বিরোধিতা সৃষ্টিতে এটি ইন্ধনও যোগাবে। এমন লোকদের এটি বুঝা উচিত যে, ইসলামের বার্তা প্রচার করতে হিম্মত ও নির্ভিকতা থাকাটা হচ্ছে এক পূর্বশর্ত।

অবশ্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তবলীগ করার সময় আমাদেরকে বিজ্ঞতার সাথে কথা বলতে নির্দেশ দান করেছেন। তা সত্ত্বেও মানুষ কেন আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, যদি আমরা কেবল 'মসীহ্ এসে গেছেন'-এ বার্তার একটি বিজ্ঞাপন এবং তৎসঙ্গে আরো একটি বার্তা-'মানবজাতিকে তিনি ভালবাসা, সহানুভূতি ও শান্তির মাঝে একত্রিত হতে অনুপ্রাণিত করেছেন'– এটি প্রচার করি? এ বিষয়ে বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন এবং উপযুক্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। এ জামাতের বা ইসলামের এমন কতক বিরোধী সর্বদাই থাকবে, যারা আমরা যা করি তার সবকিছুই নেতিবাচকভাবে প্রদর্শন করতে চাইবে, তাতে কিছুই এসে যায় না। কিন্তু এমন লোকদের ভয়ে তা থেকে আমাদের পিছিয়ে আসা এবং লুকিয়ে থাকা চলবে না। পাকিস্তান, ইন্দোনেশীয়া, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া, ভারতের কিছু অংশ এবং অন্যকতক দেশে আহমদীরা কি বড় ধরণের পরীক্ষা ও চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হচ্ছে না? এমন কি আফ্রিকাতেও, যেখানকার জনগণ এবং সরকারের সাথে আমাদের সম্পর্ক খুব ভাল, তা সত্ত্বেও সে দেশের কতিপয় অংশে জামাতের শক্তিশালী বিরোধীতা এবং নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বিদ্যমান আছে। তথাপি, এ ধরণের নির্যাতন সত্ত্বেও আমাদের আহমদীরা ভীরুতা প্রদর্শন করে না, বরং তাদের বিশ্বাসে পূর্ণ নিশ্চয়তা সহ নির্ভয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তাদের ঈমানের পক্ষে কুরবানী পেশ করতে এবং তীব্র নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে তারা সর্বদাই আগ্রহ বোধ করে। এখানে যুক্তরাজ্যে চাহিবামাত্র এ ধরনের কুরবানী করতে আপনারা কি প্রস্তুত নন?

যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় যদি তারা 'মসীহ্ এসে গেছেন'– এ বার্তা প্রচার করতে সক্ষম হয়, তবে এখানে যুক্তরাজ্যে তা সম্ভব হবে না কেন? এতে করে কিছু বিরোধীতা যদি দেখা দেয়, তবে তাতে ভীত হবেন না। এটি কমপক্ষে এমন একটি আলামত যে, আমাদের বার্তাটি জনগণের বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছেছে। তবলীগি প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ করার জন্যে নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান থাকতে হবে। এগুলোই হচ্ছে তবলীগের মূল উপাদান।

তবলীগ বিষয়ে কথা বলার পর আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে নও মোবাঈনদের (নতুন বয়আতকারী)-কে নৈতিক শিক্ষাদান করা এবং এটি নিশ্চিত করা যে, জামাতের মধ্যে তারা পূর্ণরূপে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নওমোবাঈন বিভাগ সম্প্রতি খুব ভাল কতিপয় কর্মসূচী হাতে নিয়েছে আর আমি আশা করি, এ বিষয়ে তারা তাদের প্রচেষ্টাগুলো জারী রাখবে আর তাই বিভিন্ন দফায় তাদেরও পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন। একই সাথে, সেক্রেটারী নওমোবাঈনেরও উচিত এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে, তার বিভাগকে যে তহবিলই মঞ্জুর করা হবে, তা থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জন করা হবে। নও আহমদীদের তরবিয়তের বিষয়ে একান্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় এই যে, পুরোনো আহমদীদের তরবিয়তের ওপরও শক্তভাবে জোরারোপ করতে হবে। কারণ, জন্মগত আহমদী অথবা সেসব আহমদী, যারা দীর্ঘ সময় ধরে আহমদী আছেন, তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব আহমদীকে পরিচালনা করা, যারা সম্প্রতি বয়আত করেছে আর এটি নিশ্চিত করা যে, তাদের বিশ্বাসে তারা অটল রয়েছে। এটা কেবল তখনই সম্ভব, যদি পুরোনো আহমদীরা নিজেরা ইতিবাচক উদাহরণ স্থাপন করে এবং ইসলামের খাঁটি শিক্ষাগুলোকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিফলিত করে।

সকল কর্মকর্তা এবং শূরার সদস্যগণের জন্যে নিশ্চিতভাবেই এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের আচরণের সর্বোচ্চ মান তারা বজায় রাখবে এবং এ বিষয়ে অতিউত্তম নমূনা স্থাপন করবে, যাতে অন্যরা তাদেরকে অনুসরণে উৎসাহ বোধ করে। ইতোমধ্যে যেভাবে আমি বলেছি, এটা জরুরী যে, আপনাদের সবাই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর পুস্তকগুলো এবং জামাতের অন্যান্য বইগুলোও নিয়মিতভাবে পাঠ করুন আর এ একই কাজ করার জন্যে অন্যান্য আহমদীদেরকেও উৎসাহিত করুন। অধিকন্তু, খিলাফতের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করার জোর চেষ্টা করাও জরুরী আর এ ব্যাপারে জামাতের সকল সদস্যেরই খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা শ্রবণ করাও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে তিনি জামাতকে সময়ের প্রয়োজন মোতাবেক পরিচালিত করেন। তাদের উচিত, খলীফায়ে ওয়াক্তের অন্যান্য প্রোগ্রামগুলোও শ্রবণ করা। সে মোতাবেক এটি নিশ্চিত করতে জামা'ত ও অঙ্গসংগঠনগুলোর মাধ্যমে সম্মিলিত এক প্রচেষ্টা চালানো উচিত, যেন আহমদীরা খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা ও অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো সার্বক্ষণিকভাবে শুনতে এবং তাতে গভীর মনযোগ নিবদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

অতএব, কর্মকর্তা এবং শূরার সদস্যদের উচিত, তাদের সন্তানদেরকে এম টি এ এর সাথে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত রেখে এবং তাদের ওপর সম্ভাব্য সজাগ দৃষ্টি রেখে এ কাজে পথনির্দেশ দেয়া। তরবিয়তী কার্যক্রম যদি সফল হয়, তবে আপনারা দেখতে পাবেন যে, অভ্যন্তরীণ অনেক বিষয় ও সমস্যা যা উদ্ভুত হয়ে থাকে, সেগুলো নির্মুল হয়ে

গেছে। উদাহরণস্বরূপ, তরবিয়ত যদি সঠিকভাবে করা হয়, তবে আরো অধিক সংখ্যক আহমদী সঠিকভাবে নির্দিষ্ট হারে তাদের চাঁদা প্রদানে নিয়মিত হবে এবং বর্ধিত অন্যান্য আর্থিক কুরবানীগুলোও করতে থাকবে।

একইভাবে, ঘরোয়া এবং বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যাদি, যা দীর্ঘদিন থেকে বেড়েই চলেছে, সেগুলো কমতে থাকবে, যদি স্বামীগণ এবং তাদের স্ত্রীগণ পরস্পরে ভালবাসা এবং সম্মানের সাথে আচরণ করে এবং তাদের ঈমানের যেসব চাহিদা রয়েছে, সেগুলো ফোকাসে আনে। চলমান আরেকটি বিষয় হলো– জামাতের বাইরে বিবাহ করা আহমদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। সেক্রেটারী তরবিয়ত, স্থানীয় জামাতগুলো এবং অঙ্গসংগঠনগুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই আমি এ নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন এমন চেষ্টা করে, যাতে এ ঝোঁকটি উল্টে যায়, যাতে আমাদের তরুণীরা তাদের সাথে মানানসই জুটি খুঁজে পায়। এ বিষয়ে রিস্‌তানাতা (বৈবাহিক বিষয়াদি) বিভাগের উচিত চরমভাবে সক্রিয় হওয়া এবং এসব বিষয়ের সমাধানে জোর দেয়া। এ অবস্থাটির উন্নয়নে একাধিক সেক্রেটারী রিস্‌তানাতা নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু কাঙ্খিত ফল অদ্যাবধি পাওয়া যায় নি, যার সহজ একটি কারণ হচ্ছে তরবিয়তের অভাব আর জামাতের সদস্যদের মধ্যে বস্তুবাদিতার বৃদ্ধিপ্রাপ্তি।

অধিকন্তু, তরবিয়ত যদি সঠিকভাবে করা যায়, তবে সালাত (নামায) কায়েম করার মাধ্যমে আহমদীরা স্বাভাবিকভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ হতে অধিক আগ্রহী হবে। নামায আদায় এবং ইবাদতে মনেযোগ নিবদ্ধ করার বিষয়টি কেবলমাত্র রমযান মাসের মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত নয়, বরং তদস্থলে প্রত্যেক আহমদীর উচিত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক শক্তিশালী করার চেষ্টা সারা বছরই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চালিয়ে যাওয়া। কেবল তবেই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে সমর্থ হবো, যে কারণে এই নেযাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর কেবল তবেই আমাদের তবলীগি প্রচেষ্টাগুলো মহিমান্বিত হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে।

নিশ্চিতভাবেই, একটি জামাত ও এর অঙ্গসংগঠন– এ উভয়ের কর্মকর্তাগণ যদি জামাতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করার প্রতি বিশেষ মনযোগ দেয়, তবে আমাদের মসজিদগুলোয় উপস্থিতি সহজেই তজনিদের (সদস্য রেজিষ্টার) সংখ্যার শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগে পৌঁছে যাবে। বস্তুত মানুষ এবং সর্বশক্তিমান খোদার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার যে দূরত্ব তা বিদূরিত করাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য, যেদিকে মানবজাতিকে পরিচালিত করতেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) প্রেরিত হয়েছিলেন।

এভাবে পরিশেষে আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর মহিমান্বিত সেই কথাটি বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই, যার মাধ্যমে খোদাভীরুতার সত্যিকার প্রয়োজনটি তিনি ব্যক্ত করেছেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন: 'প্রত্যেক ভাল কাজ কেবল তখনই মূল্যবান হয়, যখন সেটি ধর্মভীরুতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যথায়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক তা গৃহীত হয় না'। তিনি (আ.) আরো বলেন: "খোদাভীরুতা অবলম্বন করাই হচ্ছে আমাদের জামাতের বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এ জামাতের সদস্যরা নিজেদেরকে এমন এক লোকের সাথে সংযুক্ত করেছে এবং তার হাতে বয়আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে, যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত হয়েছেন, যাতে সেসব লোক, যারা যেকোন ধরণের পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত অথবা বৈশ্বিকতায় নিমজ্জিত, তারা এসব মন্দ থেকে মুক্তি পেতে পারে'।

অন্য এক স্থানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেন: 'ধর্মভীরুতা বা তাকওয়ার অনেকগুলো স্তর রয়েছে। ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করা এবং আত্মপ্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা, অন্যায় অথবা অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ থেকে দূরে থাকা এবং সর্বপ্রকার অনৈতিক কার্যকলাপ ত্যাগ করা– এর সবগুলোই হচ্ছে ধর্মভীরুতার অংশ।

এভাবে, সব আহমদীর, বিশেষ করে কর্মকর্তা ও শূরার সদস্যদের উচিত, সব ধরনের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা এবং ধর্মভীরুতায় সর্বদাই উন্নতির আকাঙ্খা পোষণ করা। পরিশেষে, আমি দোয়া করি যে, আপনাদের ওপর যেসব দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, সেগুলো পালনে আল্লাহ্ আপনাদেরকে সার্বিক ক্ষমতা দান করুন। আমি দোয়া করি যে, আপনারা যেসব পরামর্শ বা মতামত প্রকাশ করেন, তা যেন আমাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণকৃত খোদাভীতির সাথে করা হয় এবং সর্বদাই আপনারা আল্লাহ্‌র নির্দেশকে আপনাদের মনের পুরোভাগে স্থান দেন। অধিকন্তু, শূরার সুপারিশগুলো যেভাবে শূরা কর্তৃক প্রস্তাব করা হয়েছে অথবা তাতে কতিপয় সংশোধন সহ যদি আমার দ্বারা অনুমোদিত হয়, আপনাদেরকে তার ওপর কাজ করা এবং যা নির্ধারিত হয়েছে, তা স্থির-প্রত্যয় ও পূর্ণ আনুগত্যের সাথে বাস্তবায়নে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যেন আপনাদেরকে তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা দিন, আমীন। এবার আপনারা নীরব দোয়ায় আমার সাথে যোগদান করুন।

ভাষন্তর: **মোহাম্মদ ফজলুর রহমান**
ওয়াকেফে জিন্দেগী

বিশ্বশান্তিঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(৩৩তম কিস্তি)

অর্থনৈতিক ঐক্যের মাধ্যম হিসেবে এবাদত বা উপাসনা

১. এক খোদা ছাড়া অন্য আর কোনও খোদা বা ঈশ্বর নেই। এই সত্যের স্বীকৃতির দ্বারা শুরু করলে আল্লাহ্‌র একত্ব এবং তাঁর সৃষ্টির একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং এর দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করা হয়।

২. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায, যা জামাতবদ্ধভাবে আদায় করাই বাঞ্ছনীয়, তা এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ, সর্বাপেক্ষা কার্যকর একটি পন্থা। ধনী এবং গরীব, ছোট এবং বড় সব স্তরের লোকদেরকে বিনাব্যতিক্রমে একসাথে সম্ভব হলে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে হয়। সবাই না হলেও, মুসলিম সমাজের একটা বৃহৎ অংশ এই নির্দেশ পালনে বাধ্য। যারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করেন তাদের শতকরা সংখ্যা কোন কোন দেশে কম হতে পারে এবং কোন কোন দেশে বেশী। কিন্তু এটা একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা যা কম বেশী অধিকাংশ মুসলমানই অর্জন করে। নামাযের পদ্ধতিটাই স্বয়ং মানুষের কাছে সাম্যের এক মহান বাণী, যে ব্যক্তি প্রথমে মসজিদে যান, তিনি তাঁর পসন্দমত জায়গায় বসেন, তাঁকে অপর কেউই, তা তিনি সমাজের যত উঁচুস্তরের লোকই হন না কেন, সরিয়ে দেবার চিন্তাও করতে পারেন না। নামাযের সময় সবাই, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কোন ফাঁক না রেখে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। অত্যন্ত পরিপাটিরূপে সজ্জিত কোন ব্যক্তির পাশেই হয়তো দেখা যাবে যে, একজন ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিহিত লোক দাঁড়িয়ে আছে। রোগাটে ও দুর্বল এবং স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী সবই প্রত্যহ একত্র মিলিত হয় একই প্লাটফর্মে, যেখানে প্রতিনিয়ত বার বার ঘোষিত হয় এই বাণী ঃ 'আল্লাহু আকবার'– আল্লাহ্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ।

কোন একটি এলাকায় বসবাসকারী দুঃখ-দৈন্যে পীড়ত লোকদের সঙ্গে যদি সেই একই এলাকার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গে দৈনিক দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহলে সেই আরাম-আয়েশে জীবনযাপনকারী ব্যক্তির হৃদয় তার একটা শক্তিশালী প্রভাব না পড়েই পাড়ে না। এর মধ্যে যে বাণী নিহিত তা অত্যন্তজোরালো এবং পরিষ্কার, এবং তা হচ্ছেঃ তোমাকে অবশ্যই তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার জন্য কিছু একটা করতেই হবে এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হবে। অন্যথায়, তুমি খোদার দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যাবে এবং তোমার নিজের কাছেও তুমি নিজে ছোট হয়ে যাবে।

যোগাযোগ ও মেলামেশার এই এলাকাটা প্রতি শুক্রবার সম্প্রসারিত হয়। তখন আশেপাশের সব এলাকার মুসলমানেরা সম্মিলিত হয় একটা কেন্দ্রীয় মসজিদে। ফলে, প্রতিবেশী ধনী মহল্লার লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় গরীব মহল্লার লোকদের। যোগাযোগের এই এলাকা আরও বেশী সম্প্রসারিত হয় বছরে দু'বার দুই ঈদের উৎসব। তখন উৎসবের পূর্বে 'ফিৎরানা' দেওয়া হয়; এই ফিৎরানা হচ্ছে এমন একটি ফান্ড, যা স্বেচ্ছা প্রদত্ত দানের দ্বারা গঠিত, এবং তা বিতরণ করা হয় গরীবদের মধ্যে।

৩. রমযান মাস (মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত উপবাস-পালনের মাস) ধনী ও গরীব উভয়কেই একই সমতলে নিয়ে খাড়া করে দেয়। এই মাসে ধনীদেরকেও সমভাবেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বরদাস্ত করতে হয়। এতে করে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, গরীবরা কীভাবে জীবনভর ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে।

৪. 'যাকাত'-এর বিত্তশীলদের পুঁজি থেকে গরীবদের কাছে তাদের পাওনা হক্ বা অধিকার স্থানান্তরিত হয়।

৫. পরিশেষে রয়েছে ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জ, যাকে বলা হয় মানব-ঐক্যের বৃহত্তম সম্মেলন বা প্রদর্শনী। তখন হজ্জ পালনকারী মহিলাদেরকে সাদাসিধে সেলাইকরা কাপড় পরবার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং পুরুষদেরকে অনুমতি দেওয়া হয় সেলাই-ছাড়া দু'প্রস্থ কাপড় পরতে এবং এটাই হজ্জের ইউনিফর্ম, ধনী-দরিদ্র সবার জন্যই।

কিন্তু, এটাই সবটা নয়। উল্লিখিত নয়। উল্লিখিত কর্মকাণ্ড ছাড়াও মুসলিম সমাজে আরও নানাবিধ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে প্রচলিত রয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমাগতভাবে কমতে থাকে এবং একটা সুস্থ পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস চলাচলের রাস্তা তৈরী হয়। যে পরিবেশে ধনীরা একটা যুক্তসম্মত সীমার মধ্যে ধনী থাকবে বটে, কিন্তু তাদেরকে গরীবদের দেখা শোনা করতে হবে, প্রয়োজনে সাহায্য-সহায়তা করতে হবে।

অনুরূপ একটা নীতির কথাই ব্যক্ত করেছেন হযরত ঈসা (আ.) যখন, তিনি বলেছেনঃ 'নম্র ও নিরীহগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।' এটা সত্যিই আফসোসের কথা যে, এই নৈতিক নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, পুঁজিবাদ সমাজের দরিদ্র ও নিরীহ ব্যক্তিদের যত্ন-আত্তি করতে দেখা-শোনা, একবারেই ব্যর্থ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব

সমাজ যখন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা কোন বড় ধরণের বিপর্যয়ে নিপতিত হয়, কখন বিকল্প কোন উপায় অবলম্বন করার কথা বলতে গিয়ে (দ্রঃ ইতোপূর্বে আলোচিত মৌলিক চাহিদা) পবিত্র কুরআন যে সমস্ত সঠিক পন্থার বর্ণনা দিয়েছে, তা হচ্ছেঃ

"গোলাম আযাদ করা; অথবা দুর্ভিক্ষ কবলিত দিনে অন্ন দান করা; (যথা) নিকট আত্মীয় এতীমকে; অথবা ভূলুণ্ঠিত মিসকীনকে।" (আল্ বালাদ- ৯০:১৪-১৭)

অন্যকথায়, সঠিক পন্থাগুলো হচ্ছেঃ

১. মানবজাতির সেই যথার্থ এবং সত্যিকারের খেদমত যা খোদা তা'লার কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে, যারা দাসত্বে বা অন্য কোন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ তাদেরকে সাহায্য করা, তা সে যে কোন ভাবেই হোক না কেন। যে কোন সেবা, যা এই ধারণার বিরোধী, তা খোদার দৃষ্টিতে মূল্যহীন। এই আলোকে দেখলে দেখা যাবে যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বিভিন্ন পূর্বশর্ত এবং বিধি-বন্ধনে আবদ্ধ করে আর্থিক সাহায্য দানের যে আধুনিক পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

২. পরবর্তী পন্থা হচ্ছে, এতীমকে খাদ্য ও পানীয় দান করা, সেই এতীমের যদি অভিভাবক থাকে তবুও।

৩. শেষ পন্থা হচ্ছে সহায় সম্বলহীন সম্পূর্ণ নিঃস্ব ব্যক্তি, যাকে মনে হয় যেন সে ধূলায় মিশে গেছে, তাকে খাদ্য ও পানীয় দান করা।

কথা যদিও একবচনেই বলা হয়েছে তবু ১৫নং আয়াতের প্রতি দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, এখানে ব্যাপক আকারের সংকটের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'ইয়াওম' (আক্ষ-দিন) শব্দের গূঢ়ার্থ এবং এখানে এর ব্যবহারের রীতি বা ষ্টাইল থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এই আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থে এই চিত্রই পরিষ্কার ফুঠে উঠেছে যে, বড় বিত্তশালী, ক্ষমতাশালী জাতিগুলো গরীব জাতিগুলোর প্রতি বিশেষ করে এই জাতিগুলো যখন সময়ে সময়ে চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে সাহায্যের অপেক্ষায় দিন গুণে, তখন কী রকম ব্যবহার করে থাকে এদেরকে সাহায্য তো দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা দেওয়া হয় নানান বাঁধনের মধ্যে। ফলে, অন্যকে সাহায্য করার আসল উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যায়, মূল প্রেরণাও নষ্ট হয়ে যায়। বহ্যতঃ, তারা একটা দুঃখ থেকে রেহাই পায় বটে, কিন্তু এর দ্বারা তারা পর মহূর্তেই আর একটা দুঃখের জালে আটকা পড়ে যায়।

বন্ধন বা শর্তযুক্ত সাহায্যের সমস্ত সমকালীন পদ্ধতিকে এখানে স্বল্প কথায় সুস্পষ্ট করেই বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যেন কোন গরীব মানুষের বা কোন গরীব জাতির দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের বিনিময়ে সেই সব মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ গ্রহণ করে কোন স্বার্থ হাসিল না করে এবং তাদেরকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না করে।

এখানে 'এতীম' শব্দটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি পরনির্ভর ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, জাতির ক্ষেত্রেও। এই সব জাতির অবস্থা জাতির ঐ সব এতীমের মতই যাদেরকে তাদের বিত্তশালী আত্মীয়-স্বজনরা পরিত্যাগ করেছে। অথচ এদেরকে সাহায্যহীন অবস্থায় ফেলে রাখা উচিত নয়। এদেরকে সাহায্য করা উচিত। এবং তা করা উচিত সেই বিত্তশালীদেরই যারা প্রাথমিকভাবে তাদের জন্য দায়ী।

এক্ষেত্রে একটি যথোপযুক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে তৈল-সমৃদ্ধ দেশগুলো। উপসাগরীয় দেশগুলোর যদি, মাত্র কয়েকটি দেশ মানবতার সীমাহীন দুঃখ-দুর্ভোগ দূর করার জন্য হাত বাড়াতো তাহলে, তারা কোন সামান্য কষ্ট বরণ না করেও আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ ও খরাজনিত সব সমস্যার সমাধান করতে পারতো। অনেক টাকার পাহাড় গড়ে তুলেছে তারা। বিপুল সম্পদ রয়েছে তাদের পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে। এই সব ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং সম্পদ থেকে যে সুদ তারা পায়, যে আয় তারা করে, শুধু তা দিয়েই গোটা আফ্রিকার দুঃখ-দুর্দশা মোচন করা সম্ভব। আর যাই হোক, ইসলাম তো নিষেধ করে তাদের ঐসব সুদের টাকা তাদের নিজেদের জন্য খরচ করতে।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘন ঘন প্রকৃতিক দুর্যোগের দরুন দেশটি ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশার এক বিশাল সাগরে পরিণত হয়েছে। বাদবাকী দুনিয়াটা সে দেশের জনগণকে তাদের ভাগ্যের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। ফোঁটা-ফাঁটি যে সাহায্য তাদেরকে দেওয়া হয় তা তাদের দুঃখ-দৈন্যের তুলনায় কিছুই নয়।

এই সব জাতিকে 'এতীম' শব্দটির ব্যাপক অর্থ অনুযায়ী এতীমরূপে বিবেচনা করতে হবে। এই সমস্ত জাতিকে যখন তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে, তখন তা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে কঠিন অপরাধ বলে বিবেচিত হয়।

গরীব জাতিগুলো দুঃখ-দুর্দশার জন্য মানুষ খোদা তা'লা এবং প্রাকৃতির বিরুদ্ধে এক প্রকার হাস্যকর এমনকি বক্র মনোভাব পোষণ করে থাকে। যদিও এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের প্রতি মনুষের চরম হৃদয়হীনতা ও অবজ্ঞার জন্য মানুষ নিজেই দায়ী। আমরা যদি সব মানুষের

হৃদয়গুলিকে সহৃদয়তা ও সহমর্মিতার বিশেষ বিশেষ গুণে ভারপুর করে দিতে পারি এবং অপরের জন্য দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে পারি, তাহলে এই পৃথিবীটা এখনও বেহেশ্‌তে রূপান্তরিত হতে পারে।

ইসলামী জাহানের বাইরের দুনিয়াতে একই স্বার্থপর মনোভাব বিরাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ ইথিওপিয়ার কথা বলা যায়। দেশটির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। সুতরাং, এই অজুহাতে দেশটিকে সাহায্যদান বন্ধ করা ঠিক হবে না যে, এটাতো সোভিয়েত ইউনিয়নেরই (রাশিয়ারই) দায়িত্ব। সুদানের লক্ষ লক্ষ মুসলমান যদি দুর্ভিক্ষে না খেয়ে মারা যায়, তাহলে তাদের দুঃখ-যাতনা এই অজুহাতে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না যে, তাদেরকে তো খাওয়ানোর দায়-দায়িত্ব সৌদী আরবের এবং অন্যান্য তৈল-সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর, কেননা, তারাই না আসলে তাদের আত্মীয়, স্বজন। এটাই হচ্ছে আরবী 'ইয়াতীমান যা মাকরাবাতে'-এর সত্যিকার তাৎপর্য, যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে– 'নিকট আত্মীয়, এতীম'।

আবার এটাও এ আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তি অথবা জাতি যেই হোক না কেন, কেউ যদি ব্যক্তিগতভাবে বা জাতিগতভাবে অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়, তাহলে তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। এর প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, যে দেশগুলো সময়মত, পর্যাপ্ত সাহায্যের অভাবে দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছে।

তৃতীয় পন্থা হচ্ছে, 'আও মিসকীনান যা মাতরাবাতে' যা প্রযোজ্য সেই সমস্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেগুলি ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং যেখানে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই সম্পূর্ণরূপেই ভেঙে পড়েছে। পবিত্র কুরআনের মতে, সেই সব দেশের জনসাধারণকে শুধু খাদ্যদান করাটাই যথেষ্ট নয়; এসব ক্ষেত্রে এমন সব ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে যাতে তাদের অর্থনীতিকে পুনস্থাপিত করা যায়, পুনর্বাসিত করা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে, হাল যামানার বাণিজ্য-সম্পর্ক ঠিক এর উল্টোটা। সম্পদের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে ধানাঢ্য এবং উন্নততর দেশগুলোর দিকেই। পক্ষান্তরে দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতি ঋণের অতলে ডুবছে তো ডুবছেই।

আমি কোন অর্থনীতিবিদ নই, তবে এতটুকু অন্ততঃ বুঝি যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পক্ষে এটা অসম্ভব যে, তারা উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক বজায় রেখেও চলবে, আবার সেই সঙ্গে তাদের দেশ থেকে ধনী দেশগুলোতে সম্পদের প্রবাহও বন্ধ করবে এবং তার দ্বারা রপ্তানী আয় ও আমদানী বিল সমান সমান রাখবে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার, অর্থনৈতিকভাবে উন্নত সমস্ত দেশেই লক্ষ্য করা যায় যে, তারা তাদের জীনবযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সব সময় উদগ্রীব থাকে। তাদের এই উর্ধ্বমুখী জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য গরীব দেশগুলোকে উৎসাহিত করা হয় টাকা ধার করার জন্য। উন্নতির সহজ-লভ্য প্রযুক্তি জীবনকে করে তুলছে সহজতর এবং আরামপ্রদ। যদিও, সেই সমস্ত আধুনিক উপকরণের আসক্তি, অবশেষে মানব চরিত্রের ওপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তারা কষ্টসহিষ্ণুতাকে তিরোহিত করে। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর লোকেরা যদি চায় যে, তাদের দেহের রক্ত বাড়তেই থাকুক, তাদের গালগুলো রক্তে আরও লাল হয়ে উঠুক, তাদের দৈহিক স্বাস্থ্য আরও সুঠাম হয়ে উঠুক, তাহলে কি করে আশা করা যায় যে, তারা গরীব দেশগুলোকে মারাত্মক ও ক্রনিক বা চরম রক্তশূন্যতা থেকে সেরে উঠবার সুযোগ দিবে? কেননা আরও রক্তের জন্য তাদের নিজেদের যে পিপাসা তার তো কো নিবৃত্তি নেই, তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতিতেও তো কোনও ক্ষতি নেই! কাজেই, টাকা দিয়ে যা কিছু কেনা যায়, তাতো সবকিছু এবং সব সময়েই স্থানান্তরিত হতে হবে তাদেরই অর্থনীতিতে!

কোন প্রকার বাছ-বিচার ছাড়াই জীবন-মান উন্নয়নের এই যে উন্মত্ত প্রতিযোগিতা, তা শুধু যে গরীব দেশগুলোর উত্তরণের সুযোগ-সুবিধাই লুণ্ঠন করছে তাই নয়; তা বরং উন্নত দেশগুলোরও মনের শান্তি এবং হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হরণ করছে। সমগ্র সমাজটাই কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট চাহিদা পূরণের আশার পিছনে মিছে ছুটে চলছে। সবাই সবার একটা না একটা কিছুর জন্য সর্বক্ষণ উদগ্রীব অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, যেন সবাই সবার ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাচ্ছে। এটাও এমন একটা অবস্থা যা সমাজকে যুদ্ধের দিকে ধাবিত করতে সক্ষম।

এই প্রতিযোগিতার প্রবণতাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে। ইসলাম আপনাদের সামনে এমন এক সমাজের চিত্র তুলে ধরে, যার অধিবাসীরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনযাপন করে এবং দুর্দিনের জন্যেও কিছু সঞ্চিত রাখে এবং তা শুধু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়েই নয়, জাতীয় পর্যায়েও।

এই প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিটা দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বিপজ্জনকও বটে। কেননা, যখন উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল অর্থনীতির সঙ্গে নতুন নতুন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়, এবং তাদের নিজেদের অর্থনীতিতে স্থবিরতা দেখা দেয়, তখন তারা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকতর কঠোর হয়ে ওঠে। এটা অনিবার্যরূপেই ঘটে। কারণ, ধনীদেশগুলোর সরকারগুলোকে যে করেই হোক, তাদের জনগণের জীবন-মান এমন একটা যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতেই হবে, যে পর্যায়ে জীবনযাপন করতে তারা অভ্যস্ত।

অবশেষে, এই সমস্ত পরিস্থিতিরই অবনতি ঘটতে থাকে এবং তা এমন সব অবস্থার ও উপকরণের উদ্ভব ঘটায়,যার পরিণাম যুদ্ধ। এবং এগুলোইতো সেই সব যুদ্ধ যা প্রতিহত করতে চায় ইসলাম।

(চলবে)

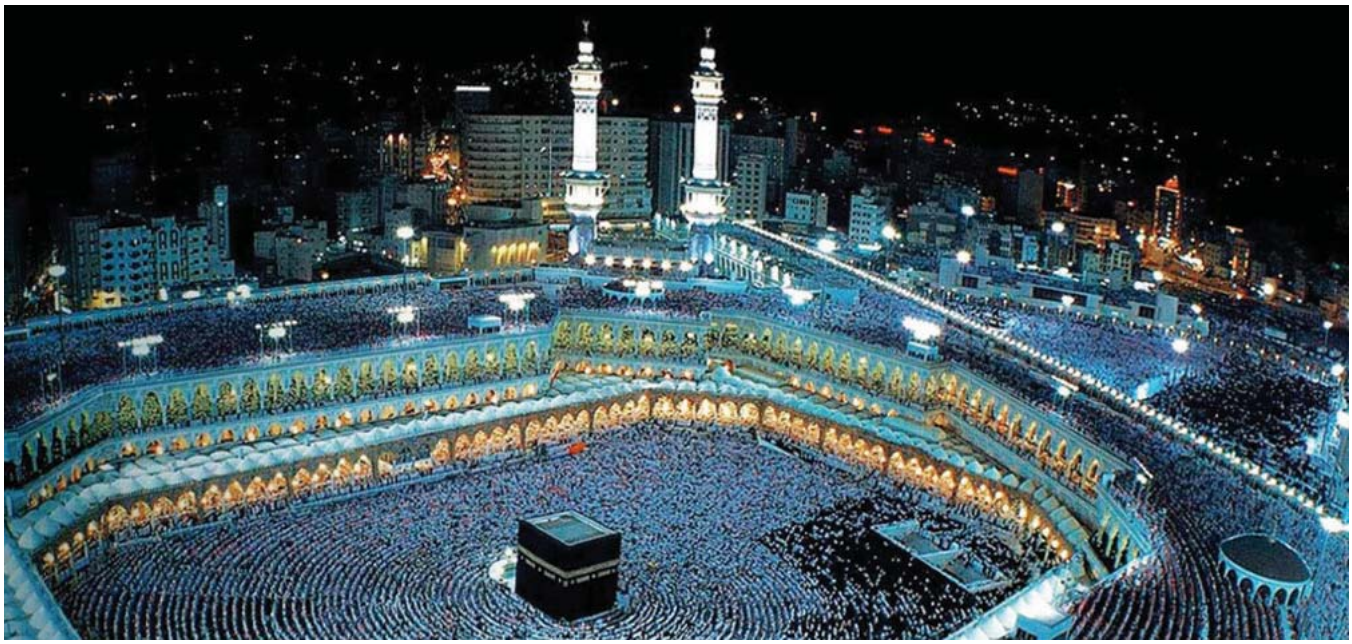

কুরবানীর উদ্দেশ্য: কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় আর ক'দিন পরেই আমরা পবিত্র ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন করব, ইনশাআল্লাহ। এ ঈদকে কুরবানীর ঈদ বলা হয়। কুরবানী প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন: 'এবং আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা সেসব গবাদি-পশুর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয়, যেগুলো তিনি তাদেরকে দান করেছেন' (সূরা হাজ : ৩৪)। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামে এই যে কুরবানীর শিক্ষা, তা কি কেবল একটি পশু কুরবানীর মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়ে যায়? আসলে পশু কুরবানী করাটা হচ্ছে একটা প্রতিকী-কুরবানী মাত্র। আল্লাহ্ তা'লা চান, মানুষ যেন তার পশুসূলভ হৃদয়কে কুরবানী করে, তার আমিত্বকে কুরবানী করে আর তার নিজের সমস্ত চাওয়া-পাওয়াকে আল্লাহ্‌র খাতিরে কুরবানী করে দেয়।

আমরা জানি, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর কুরবানীর অনুসরণে মুসলিম উম্মাহ্ প্রতি বছর ১০ই যিলহাজ্জ তারিখে পশু কুরবানী করে থাকে। ইসলামে কুরবানীর প্রথা হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুরো পরিবারের অসাধারণ কুরবানীর ফলশ্রুতিতেই সদা জাগরুক রয়েছে। এই কুরবানী মূলত একটা বাহ্যিক আলামত ছিল, কিন্তু তাঁদের এটাই কামনা ছিল যে, এর মাধ্যমে যেন অতুলনীয় সেই কুরবানীর স্মৃতি চিরদিন বিরাজমান থাকে।

হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর পবিত্র বংশ মক্কার জল, ঘাস তরুলতা, ফল-ফুল শূন্য উপত্যকায় সেই অনুপম ফল উৎপাদন করলো, যার ফুৎকারে পৃথিবী আধ্যাত্মিকতায় সজীব হলো আর আজো সজীব আছে এবং চিরকাল থাকবে। এজন্যই মহানবী (সা.) বলতেন "আমি দুই যবেহ্‌কৃত সত্ত্বার পুত্র" (তারিখুল খসিস)। এই দুই কুরবানীর মধ্যে এক হলো ইসমাঈলের দেহ, যাকে জল-শূন্য, বৃক্ষ-লতা-শূন্য এক মরু উপত্যকায় বাস করতে দেওয়া কার্যত যবেহ্ করারই শামিল। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইসমাঈলের রূহ্ যা খোদার হুযূরে ধর্মোদ্দেশ্যে ওয়াক্‌ফ (উৎসর্গ) হয়ে কুরবান হয়েছিল।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও তাঁর পুরো পরিবারের কুরবানী ছিল এমনই। তারা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যক্তিসার্থকে ত্যাগ করেছিলেন। আল্লাহ্‌র সাথে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য আল্লাহ্ পাক কুরবানী চান আর এ কুরবানীর অর্থ কেবল পশু জবেহ্ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ কুরবানী কারো জন্য নিজ প্রাণের কুরবানীও হতে পারে আবার কারো নিজ অন্তরে লুকায়িত পশুত্বের কুরবানীও হতে পারে। আমরা যদি মনের পশুকে কুরবানী করতে পারি, তাহলেই আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়দের অন্তর্ভূক্ত হতে পারব। এছাড়া বাহ্যিকভাবে যত বড়-পশুই কুরবানী করি না কেন, তা মহান আল্লাহ্‌র

কাছে মূল্য রাখে না। আল্লাহ্ তা'লা মানুষের হৃদয় দেখে থাকেন। কে কোন্ নিয়্যতে কুরবানী করছে এটাই আল্লাহ্ দেখেন।

ঈদুল আযহিয়া সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রদত্ত খুতবার এক অংশে বলেন– "কুরবানীর গোশ্‌ত আল্লাহ্ তা'লার নিকট পৌঁছায় না।" (সূরা হজ্জ, ৩৮ আয়াত) কুরবানীর ব্যাপারে খোদা গোশ্‌তের আকাঙ্খী নন। খোদাকে পাওয়ার জন্য 'তাক্‌ওয়া' চাই। তিনি আমাদেরকে তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাবার একটা উপায় শিক্ষা দিয়েছেন। 'অধম উত্তমের জন্য কুরবানী করবে।' তাক্‌ওয়া তবেই লাভ করা যায়, যদি সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করা না হয়। ধর্মজ্ঞান লাভ কর, কিন্তু জ্ঞান লালন ও কার্যকর করাকে সবার উপরে স্থান দিবে। আমি শুধু শিক্ষার্থীদেরকেই বলছি না। এখানে যারা আছেন, সকলেই জ্ঞান অন্বেষণ করছেন। সকলেই শিক্ষার্থী। এ খুতবাও এক শিক্ষা। দেখুন, খোদাতা'লা হযরত ইবরাহীম আলইহিস্ সালামকে আদর্শরূপে উপস্থিত করছেন এবং বলছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্মকে কেবল 'আত্মঘাতি' ছাড়া অন্য কেউ ছাড়তে পারে না। ইব্রাহীম আলইহিস্ সালামকে খোদা অ্বলা সম্মানিত করেছেন। তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আত্ম-সংস্কারদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

সারা দুনিয়াকে কুরবানী করে দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা করতে হবে। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম কত বড় কুরবানীই না করেছিলেন যে, খোদাপ্রেম লাভকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্ট 'মাহবুব' বলে দেখা যাচ্ছ। কুরবানী যে করে, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন।

কুরবানীর দৃশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। নিজ নিজ আমল (কর্ম) পরীক্ষা করুন। কথা, কাজ, আনন্দ, আচরণ ও লোকের সাথে মেলামেশা, সব বিষয়ই ভেবে দেখুন, অধমকে উত্তমের জন্য বর্জন করছেন কিনা? যদি করেন, তবে 'মুবারক' (ধন্য)। ত্রুটিযুক্ত কুরবানী আমাদের ছাড়তে হবে। আমাদের কুরবানীতে কোন প্রকার খুঁত যেন না থাকে। শিং কাটা, কান কাটা যেন না হয়। কুরবানীর জন্য তিন দিন। আধ্যাত্মিক কুরবানী যে করে, সে জানে, সবই তার জন্য সমান। (ঈদুল আযহিয়ার খুতবা, ৩ জানুয়ারী, ১৯০৯)

পবিত্র কুরআনে আলাহ্ তা'লা বলেন, 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে নামায পড়ো এবং কুরবানী কর' (সূরা কাওসার)। প্রতি বছরই সমগ্র বিশ্বে কোটি কোটি পশু আল্লাহ্‌র নির্দেশের ওপর কুরবানী হয়ে থাকে। এই যে পশু কুরবানী করা হয়, এগুলোতো আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্ কুরবানীকারীর অন্তর দেখে থাকেন। কুরবানীকারী লোক দেখানোর জন্য কুরবানী দিল না আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দিল, এটাই মূল বিষয়। আর এটাই খোদা দেখে থাকেন। কেউ যদি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার এ কুরবানী গ্রহণ করবেন। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার কুরবানীর কোন মূল্য নেই। যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে 'এগুলোর মাংস ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকট তোমাদের তাক্‌ওয়া অর্থাৎ খোদাভীতি পৌঁছে' (সূরা হাজ: ৩৭)। তাই কুরবানী করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই। কুরবানী করার পিছনে কোন প্রকারের লোক দেখানো উদ্দেশ্য যেন না থাকে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কত সুন্দরভাবেই না বলেছেন, আমরা যে পশু কুরবানী করে থাকি তা করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের অধিকাংশই এটা ভুলে যাই যে, প্রত্যেক এই কুরবানীর মাঝে এক পয়গাম (গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা) নিহিত থাকে আর মৌলিক ও মোক্ষম পয়গাম হচ্ছে এই যে, এইসব কুরবানী (পশুর) মাংস এবং রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে যাবে না এবং তা তোমরা নিজেদের মধ্যেই বন্টন করবে। বড়জোর গরীব ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে তার কিছুটা কল্যাণ সাধন করবে এবং এর বিনিময়ে তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে, অথবা নিজেদের নিকটাত্মীয় ও প্রিয়জনদের মাঝে মাংস বন্টন করবে। আর ধারায় 'ইতায়ে-যিল্‌কুরবা' (আত্মীয়-স্বজনকে দান করার ন্যায় অন্যদেরকেও দান করা) সম্পর্কীয় আদেশটির কিছুটা বাস্তবায়ন ঘটবে। কিন্তু এসবই তোমাদের নিজেদের সীমিত গন্ডীতে ফায়দার বিষয়।

বস্তুত কুরবানী প্রদানকারী ব্যক্তির তাক্‌ওয়া (খোদা ভীতি ও প্রীতিমূলক আন্তরিক নিষ্ঠা) খোদা তা'লার সান্নিধ্যে পৌঁছে থাকে। আর এই কুরবানীগুলি যদি তাকওয়া শূন্য হয়, তাহলে এগুলো হয়ে থাকে নিরেট গতানুগতিক প্রথা। এরচে বেশী কোন মূল্য এগুলোর নেই। আমি অনুভব করেছি, অধিকাংশ কুরবানী প্রদানকারী পশু যবাই পর্যন্তই নিজেদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং মনে করেন যে, ঐদিন তারা কেবল কতগুলো পশু কুরবানী দিবে, যাতে এর ফায়দা উঠাতে পারে। অথচ কুরবানীর যে (যবাই করা সংক্রান্ত আত্মোৎসর্গের) রূহ্ বা চেতনাবোধ রয়েছে, তা তাদের অন্তরে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে এবং তা তাদের হৃদয়কে স্পর্শও করে না। অথচ এর মাঝে এক পয়গাম নিহিত রয়েছে। বস্তুত সে পয়গামটি ইঙ্গিত দিচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর দিকে। তিনি (আ.) যে তাঁর পুত্র ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন পিতা ও পুত্র (আলায়হুমাস্ সালাম) উভয়ে নিজ নিজ ভূমিকা পালনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন এবং ঐভাবে নিজদেরকে কুরবানী দিতে, আল্লাহ্‌র সমীপে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন, ঈদুল আযহার এই কুরবানী সেই কুরবানীরই স্মৃতি বহন করে থাকে। (ঈদুল আযহিয়ার খুতবা, ৪-৪-১৯৯৮)

ঈদুল আযহার খুতবায় হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) যেভাবে আমাদেরকে নসীহত করেছেন ঠিক সেভাবে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে হবে। তিনি বলেন, আজকে প্রত্যেক আহমদীর কাজ হল, কুরবানী এই ঈদের প্রকৃত-মর্ম এবং তত্ত্বকে অনুধাবন করা, তাহলেই আমরা খোদা তা'লাতে বিলীন হয়ে যাওয়ার এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাঝে বিলীন হয়ে যেতে পারবো। কেননা, খোদা তা'লা আমাদেরকে বলেছেন যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, আল্লাহ্‌র সাথে প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাও, তাহলে হযরত নবী করীম (সা.) যা করেন, তোমরা তাই কর। তাঁর (সা.) সুন্নতের ওপর আমল কর, তাঁর আদেশাবলীর অনুসরণ কর, তাঁর আনীত শরীয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্য কর। **'কুল আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল'** (সূরা নূর: ৫৬)-এর মহান দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত কর।

খোদার ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন উন্নত-নমূনা প্রতিষ্ঠা কর, যেন তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গীর মাঝে একত্ববাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অবস্থা যখন এমন হবে, তখন খোদা তা'লা তাঁর এমন বান্দাকে অনেক নৈকট্য ও সম্মান দান করেন। হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, খোদা তা'লার এমন নৈকট্য ফরজের সাথে নফল আদায়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। অর্থাৎ-মানুষ যখন ফরজ আদায়ের সাথে নফলও আদায় করে, তখনই খোদার নৈকট্য লাভ করে আর আল্লাহ্ তা'লা এমন বান্দাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তার কান হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে শ্রবণ করে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই, যার মাধ্যমে সে হাটে। ইসলামে কুরবানীর গুরুত্ব অতি ব্যাপক। আল হাদিস পাঠে আমরা জানতে পারি, মহানবী (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রত্যি বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসাঈ)। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ লাভ করেছে অথচ কুরবানীর আয়োজন করে নি, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ্)। কেউ যদি মনে করে যে, প্রতি বছরই তো কুরবানী দিয়ে যাচ্ছি, এবার না দিলে কি হবে, এমন ধারনা যেন কারো হৃদয়ে উদয় না হয়।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করার তৌফিক দান করুন এবং তিনি যেন আমাদের কুরবানী গ্রহণ করেন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশ্‌তা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" ('নূরুল হক', খণ্ড ১, পৃ. ৫)

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(২৩ কিস্তি)

বায়তুর রহমান খুলনার নির্মাণ

এরপর থেকে আমরা সবাই চিন্তা করতে লাগলাম মসজিদের নিরাপত্তার জন্য কি করা যায়। আমার প্রস্তাব ছিল এখানে একটি আহমদীয়া হোস্টেল করা দরকার। খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে আহমদী ছাত্ররা ম্যাট্রিক পাশ করে খুলনায় এসে কলেজে ভর্তি হবে। ছাত্ররা মসজিদের হোস্টেলে (ছাত্রাবাস) অবস্থান করবে। খুলনা শহরে অন্যান্য ছোট শহরের কলেজের চেয়ে ভাল কলেজে তারা ভর্তি হতে পারবে। তারা মসজিদের হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করবে। এখানে থেকে তালিম-তরবিয়তও লাভ করতে পারবে। এভাবে মসজিদের জনশক্তির অভাবও দূর হবে।

আমরা ন্যাশনাল আমীর সাহেবের কাছে লিখেছিলাম যে, এখানে একটি ঘর বানিয়ে হোস্টেল চালু করা প্রয়োজন। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দফতর থেকে আমাদের জানানো হয়েছিল যে ওরকম ঘর নির্মাণের খরচ তারা দিতে পারবেন না।

এখন আমাদের চিন্তা হল যে খুলনা জামাতের বিভাগীয় কেন্দ্রের নিরাপত্তার জন্য কী করা যায়।

১৯৯১ এপ্রিল মাসে মসজিদে এবং গাড়ীতে আগুন লাগানোর পর জনাব হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ সাহেব তার ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তার রেন্ট-এ-কারের গাড়ী রাখার নিরাপদ জায়গা ছিল না। আরো কিছু কারণ দেখা দিলে সাঈদ সাহেব আমেরিকা চলে যাবার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

আমাদের মসজিদের জমির সাথে সাঈদ সাহেবের বেশ কিছু জমি ছিল। এক সময় সস্তা দামে তিনি কিনে রেখেছিলেন। এখন জামাতের সদস্যদেরকে তার জমি কিনে নিতে অনুরোধ করলেন। আমরাও খুলনা, সুন্দরবন ও আশপাশের জামাতের সচ্ছল ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ করলাম যে, আপনারা মসজিদের পাশে জমি কিনে বাসা বাড়ী নির্মাণ করুন। তখন পর্যন্ত মসজিদের কাছে অনেক দূর পর্যন্ত কোন বাড়ী ঘর ছিল না।

আমাদের আবেদনে ভাল সাড়া মিলল। অনেকেই মসজিদের পাশে বাড়ীর জন্য জমি কিনতে শুরু করলেন।

মসজিদের নিরাপত্তার জন্য খুব দোয়া করে যাচ্ছিলাম। পবিত্র রমযান মাসের শেষে আমার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় জন্ম নিল। আমাদের যথারীতি মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। বর্তমান মসজিদটি আসলে মসজিদ ছিল না। বড় একটি টিনের ঘর ছিল। এই ঘরটিকেই মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করতাম। জামাতের দাপ্তরিক কাজগুলোও এখানে সম্পাদন করা হোত। এখন আমরা যদি পৃথক মসজিদ নির্মাণ করি তাহলে এই ঘরটিকে হোস্টেল বানিয়ে এখানে ছাত্ররা অবস্থান করতে পারবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমার অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। আমি কাউকে কিছু বললাম না।

দোয়া করতে লাগলাম। মন আনন্দে ভরে গেল। আল্লাহ্ আমাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন। রোযা শেষ ঈদুল ফিতর আসল। ঈদের খুতবা শেষে নতুন মসজিদের পরিকল্পনা জামাতের সামনে উপস্থাপন করলাম।

জামাতের এখলাস, আল্লাহ্‌র সাথে জামাতের ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র উপর আস্থা দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ঈদের নামাযের পরপরই সবাই বড় জোশ আর আবেগ নিয়ে বললেন অবশ্যই আমরা নতুন মসজিদ বানাব। সবাই তখনই ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) লেখানো আরম্ভ করলেন। আমাদের সবাই সাধারণ গরীব চাকুরীজীবি ছিলেন। যে যার সাধ্যমত ওয়াদা লিখালেন। আমার খুব স্মরণ আছে মোট ২৫০০০/= পঁচিশ হাজার টাকার ওয়াদা হয়ে গেল। সবাই আগামী কুরবানী ঈদের ঈদ-বোনাসের টাকা মসজিদে দিবেন বলে ওয়াদা করলেন।

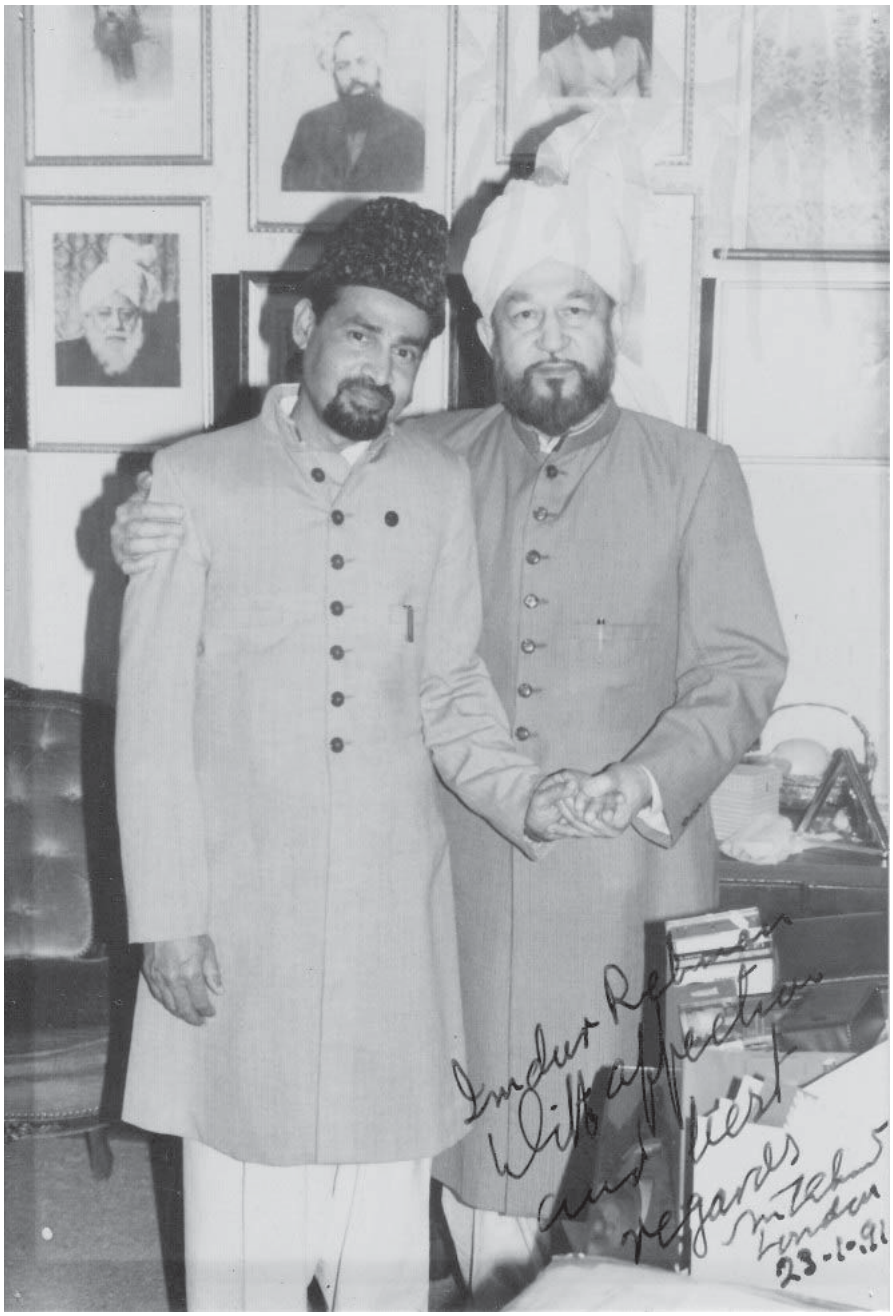

খলীফা রাবে (রাহে.)-এর সান্নিধ্যে ১৯৯১– ছবিতে হুযূরের স্বাক্ষর।

আমাদের জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব জামাতের সকলের কথা উল্লেখ করে মসজিদ নির্মাণের অনুমতির জন্য মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে লিখলেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আমরা সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে বিশেষ কোন ধনী ব্যক্তির কাছে পৃথক করে টাকার অনুরোধ করা হবে না। কোন বড় ব্যক্তির বড় অঙ্কের টাকার অপেক্ষায় প্রহর গণা হবে না যে অমুকের এত টাকা পেলে তবে কাজ আরম্ভ হবে। বরং আমরা ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত তারিখে মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করে দিব। মোহতরম আমীর সাহেব সকল জামাতে সার্কুলার করবেন যে খুলনায় মসজিদ হচ্ছে। যারা আগ্রহ রাখেন তারা এই মসজিদ ফান্ডে টাকা জমা করাতে পারবেন।

খাকসার আমার নিয়মমত হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এর খেদমতে বিস্তারিত ঘটনা লিখে দোয়ার আবেদন করলাম। খুব সম্ভব আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাজে খুশি হয়েছিলেন।

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম নির্ধারিত সময়ে কাজ আরম্ভ করা হবে। হাতে যে রকম টাকা হবে কাজও তদ্রুপ হবে। অর্থাৎ মসজিদের মেঝে পাকা হবে, তারপর সম্ভব হলে খুঁটি বা পিলার পাকা হবে। তারপর সম্ভব হলে দেয়াল পাকা হবে। তারপর সম্ভব হলে ছাদ টিনের হবে, নয়তো গোলপাতার ছাদ হবে।

আমরা এমন সময় এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যখন কোন কোন জামাতের পক্ষ থেকে আমীর সাহেবের কাছে আবেদন করা হতো যে আমীর সাহেব আমাদের মসজিদের জায়নামাযের পাটি বা চাটাই নাই। অমুক ধনী ব্যক্তিকে বলুন তিনি যেন আমাদের মসজিদের জন্য ভাল চাটাইবা জায়নামায কেনার ব্যবস্থা করে দেন।

আমরা নির্ধারিত সময়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। বিরোধীরা খবর পেয়ে গেল এবং কে.ডি.এ (খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) তে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল যে আমরা প্ল্যান পাশ করা ছাড়াই নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছি।

অভিযোগ ঠিক ছিল। ঘটনা এই যে, আমরা পাকা মসজিদ নির্মাণ করতে পারব কি না জানা ছিল না। আমরা ভেবেছিলাম হয়ত গোলপাতার ঘর তৈরী করতে পারব। তাই প্ল্যান পাশ করার কথা চিন্তা করা হয়নি। ইট-সিমেন্টের পাকা দালান না হলে প্ল্যান পাশ করানোর দরকার হয় না।

কে. ডি. এ.-এর একজন কর্মকর্তা আমাদের জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব এস.এম. আব্দুল আযিয সাহেবের পরিচিত ছিলেন। আমরা তার সাথে দেখা করে আমাদের অবস্থার কথা খুলে বললাম। তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন দ্রুত প্ল্যান পাশের জন্য অফিসে প্ল্যান জমা দেন। আর দ্রুত কাজ কিছু এগিয়ে নিয়ে নামায পড়া আরম্ভ করে দেন।

আমাদের দেশে অনেক মৌলভী সাহেব অনেক সময় সুযোগ বুঝে কোন অবৈধ স্থানে পাকা মেঝে বসিয়ে চারদিকে দুই-তিন ফিট ইটের দেয়ালের মত বানিয়ে নামায শুরু করে দেয়। আর মাইক লাগিয়ে প্রচার আরম্ভ করে দেয় যে মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। মুক্ত হস্তে দান করুন। তাদেরকে আর কেউ সরাতে পারে না।

আমরা নিজস্ব নির্ধারিত স্থানে মসজিদ আরম্ভ করেছি। অতএব চিন্তার কারণ নাই।

আমরা মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে সমস্যার কথা লিখে অগ্রিম টাকা চাইলাম। এ সময় টাকা না হলে কাজ কিছু অগ্রসর না হলে সমস্যা হতে পারে। আমাদের মসজিদ ফান্ডে আস্তে আস্তে টাকা আসবে। তখন আমরা আমীর সাহেবের অফিস থেকে নেয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেব। আমাদের অতীতের কর্মকান্ডের ভিত্তিতে আমীর সাহেব আমাদের উপর আস্থা রাখলেন যে, আমরা ওয়াদা অনুযায়ী টাকা অবশ্যই ফেরত দিব। আমাদেরকে অগ্রিম টাকা দিয়ে দিলেন। আমরা দ্রুত কাজ এগিয়ে নিলাম।

মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর সাহেব এভাবেও সাহায্য করলেন যে তিনি বললেন খুলনা বিভাগীয় শহরের বুকে আমাদের মসজিদে গোলপাতার ছাউনি হবে এটা অসুন্দর। তিনি মসজিদের ছাদের জন্য টিন বরাদ্দ দিলেন।

পরিস্থিতি জানিয়ে নিয়মিত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহ.) এর খেদমতে দোয়ার জন্য লিখছিলাম। হুযুর (রহ.) খুব খুশি হয়ে আমাদের মসজিদের জন্য পাঁচশ পাউন্ড ন্যাশনাল আমীর সাহেবের মাধ্যমে পাঠালেন। আর খাকসারের জন্য পঁচিশ পাউন্ড তোহ্‌ফা (উপহার) সরাসরি আমাকে ব্যাংক চেকের মাধ্যমে পাঠালেন। আলহামদুলিল্লাহ। জাযাহুমুল্লাহু আহসানাল জাযা। মসজিদের নির্মাণ কাজ চলছিল। ইতোমধ্যে বিভিন্নভাবে এমন ঘটল যে আমার লন্ডন জলসায় যাবার সুযোগ তৈরী হল। ঐ সময় বলা হয়েছিল যে, জামাতের মুরুব্বী কেউ লন্ডন জলসায় নিজ খরচে যেতে চাইলে তাকে অর্ধেক খরচ জামাতের পক্ষ থেকে দেয়া হবে। আমার অর্ধেক টাকা ন্যাশনাল জামাত দিলেন। যাহোক লন্ডন জলসায় যাবার সৌভাগ্য হয়ে গেল। জলসা শেষে হুযুরের সাথে সাক্ষাত করলাম। হুযুর প্রথম থেকেই আমাকে জানতেন। হুযুর বললেন, আপনার স্বাস্থ্য খুব খারাপ, আপনি কিছু দিন লন্ডনে থেকে যাবেন।

খুলনা মসজিদের জন্য হুযুরের (রহ.) খেদমতে নাম প্রস্তাবের আবেদন করলাম। হুযুর মসজিদের নাম দিলেন মসজিদ বায়তুর রহমান। আল্লাহর ফযলে মসজিদের মেঝে ও পিলার আর দেয়াল পাকা এবংটিনের ছাদ হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ। মসজিদ বায়তুর রহমান নির্মাণ সম্পন্ন হলে জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব ফটো পাঠালেন। হুযুর ফটো দেখে খুব খুশী হলেন, দোয়া দিলেন।

এখানে বলে রাখি, জামাতের উন্নতির চাবিকাঠি কি? কিভাবে জামাতের উন্নতি হবে? জামাতের ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা সবার মধ্যে দৃঢ় ঐক্যমত্য থাকতে হবে। জামাতের উন্নতির পরিকল্পনা করবে জামাতের আমেলা। সবাই একমত হয়ে, সবাই যথাসাধ্য পরিশ্রম করবে। অর্থ কুরবানী করবে। দোয়া করবে। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর দোয়া নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার ফজল হবে। সফলতা আসবে। ইনশাআল্লাহ।

(চলবে)

Newly Released

Please visit Pakkhik Ahmadi Website :

www.theahmadi.org

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:

www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক-নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর,
মাহবুব হোসেন
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সেলুকাস!
বিচিত্র এক দেশ– পাকিস্তান

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

প্রাণহানি আর সন্ত্রাসী জঙ্গী হামলা সেখানে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা

পাকিস্তানের জন্মলগ্নে জিন্নাহর ঘোষণাঃ

"সংখ্যালঘু, যে কোন সম্প্রদায়েরই হোক, তাদেরকে রক্ষা করা হবে। যেকোন ধর্ম বা বিশ্বাস ধারন ও পালন তাদের জন্য নিরাপদ থাকবে। উপাসনার স্বাধীনতায় কোন ধরনের হস্তক্ষেপ হবে না। তাদের ধর্ম-বিশ্বাস, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের বিষয়েও তাদের নিশ্চিত সুরক্ষা থাকবে। সব ক্ষেত্রে, জাতি বা ধর্মের কোনও পার্থক্য ব্যতিরেকেই তারা পাকিস্তানের নাগরিক হবে।" (১৪ জুলাই, ১৯৪৭)

দুঃখজনকভাবে, সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে চরমপন্থী মোল্লাদের চাপের মুখে পাকিস্তানের ভৌগলিক সীমারেখায় বসবাসকারী আহমদীদেরকে অযৌক্তিকভাবে 'সংখ্যালঘু অমুসলিম' ঘোষণা করা হয়। পার্লামেন্টের এই অসহিষ্ণু ও পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত আহমদীরা সরাসরি প্রত্যাখান করেছে এবং সর্বদাই তারা নিজদেরকে মুসলিম বলেই জানে। ভূট্টো-সরকারের এই সিদ্ধান্ত, জিন্নাহ ঘোষিত ও প্রতিশ্রুত গণতান্ত্রিক মধ্যপন্থী কথিত এক দেশ পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত বিপর্যয়মূলক সাব্যস্ত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কোন আইনসভা তার নাগরিকদের বিশ্বাস বা ধর্ম নির্ধারণ করার এক্তিয়ার রাখে না।

ধর্ম একটি সংবেদনশীল এবং ব্যক্তিগত বিষয়। ধর্মীয় বিষয়াদিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এর বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে নাক গলানোর মত ন্যাক্কারজনক একটি ব্যাপার। সে অধিকার কারোরই নেই।

১৯৭৪ সালে ভূট্টো সরকারের ঐ ঘোষণার এক দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর পাকিস্তানের অন্যতম স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল আহমদীয়াত বিরোধী কুখ্যাত **'অধ্যাদেশ নং-২০'** কার্যকর করে। হতাশাপূর্ণ এবং বৈষম্যমূলক এই অধ্যাদেশটি আহমদীয়া বিরোধী পরিবেশকে এক ঘৃণাত্মক প্রচারণায় পরযবসিত করেছে। 'পাকিস্তান' জঙ্গি ও মোল্লাতান্ত্রিক বলয়ের এমন এক দেশ, রাস্তায় প্রদর্শিত পেশিশক্তি-বলে যেখানে রাজনৈতিক অধিকার ফলানো যায়।

আহমদীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসমর্থিত এই বৈষম্য তাদের দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনে চরম দুর্ভোগ টেনে এনেছে। নির্বিঘ্নে আযান দিয়ে তারা নামায আদায় করতে পারছে না, সন্ত্রাসী মোল্লারা তাদের মসজিদগুলো ধ্বংস করছে, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি এবং হত্যাকাণ্ডসহ অন্যান্য গুরুতর সমস্যাদিতে আহমদীরা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার দাবীদার হালের পাকিস্তান সরকার পূর্বের মতই আহমদীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা রক্ষা তো দূরের কথা, উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হচ্ছে।

কুখ্যাত অর্ডিন্যান্সের পর শাহাদত বরণ করেছেন শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ সর্বস্তরের আহমদীরা

গত মাত্র এক বছরের প্রতিবেদন অনুযায়ী লাহোরে একজন নারীসহ চারজন আহমদীকে শহীদ এবং দুইজনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগ এনে অভিযুক্ত করা হয়েছে আরো মোট ৭৭জন আহমদীকে। জঙ্গীরা এই এক বছরে হামলা চালিয়ে নয়টি আহমদীয়া মসজিদ বিধ্বস্ত বা ধ্বংস করেছে। আদালত কর্তৃক তিনজন আহমদীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় আর অপর তিনজনের বিরুদ্ধে ঈশ্বর-নিন্দার মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করানো হয়। অপরদিকে ২০১৭ সালের কেবল মার্চ মাসেই ৪০জন আহমদীর বিরুদ্ধে কুখ্যাত সেই অডিন্যান্স অমান্য করার মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়।

বিচারবিভাগীয় নির্যাতনমূলক এই আইনীধারা আহমদীদের দুশ্চিন্তা অনেকাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে। উচ্চতর বিচারবিভাগের ওপর দেশের কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণেরই নয়, বরং সকল নাগরিকের অধিকার ও সম্মাণ সমভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার দায়িত্ব বর্তায়।

তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের ইসলামাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শওকত আজিজ সিদ্দিকী এই বছরের মার্চে প্রদত্ত একটি অযৌক্তিক রায়ে আহমদীদেরকে কঠোরতর এক প্রান্তিকাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

কোর্ট উক্ত রায়ে সরকারকে আদেশ দেয় যে, পাকিস্তানের নাগরিকরা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মুসলিম বা অ-মুসলিম শনাক্তকরণ পরিচিতি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশের নিশ্চয়তা দেবে। নিবর্তনমূলক এ রায় প্রথমত, বিচ্ছিন্নতাবাদকে শুধু সমর্থনই করে না, বরং উস্কিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, এটি দেশের সংহতিরও পরিপন্থী বটে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আহমদীরা রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছিল এবং এখনও তা-ই আছে। বিখ্যাত আহমদী ব্যক্তিত্বের মধ্যে রয়েছেন স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান, নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর ড.আব্দুস সালাম, এয়ার মার্শাল জাফর চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আখতার হোসেন মালিক, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আব্দুল আলী মালেক, মেজর জেনারেল ইফতিখার জানযুয়া, সাহেবজাদা এম. এম.আহমদ এবং সাহেবজাদা আব্দুল কাইয়্যুম প্রমুখগণ। দক্ষতা অর্জন করে একনিষ্ঠ সেবা দিয়ে দেশের ৭০বছরের ইতিহাসে তারা নিজেদেরকে সেরা হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

এরপরও দুর্ভাগ্যবশত উল্লেখিত রায়ে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট রাষ্ট্র ও তার প্রতিষ্ঠান– বিচারবিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী এবং সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত করা কালে মুসলিম ও অমুসলিমদেরকে পৃথক করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি শপথপত্র প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছে। উপরন্তু, রায়টিতে নাগরিকদের থেকে নির্দেশিত এই শপথপত্র গ্রহণ রাষ্ট্রের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন এর নাগরিকরা কম্পিউটারাইজ্‌ড জাতীয় পরিচয়পত্র (সিএনআইসি), পাসপোর্ট বা জন্ম নিবন্ধনপত্রের জন্য আবেদন করবে অথবা ভোটার তালিকাতে নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চাইবে; আর এর জন্য কোর্ট রাষ্ট্রের ডাটাবেস ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকে (এনএডিআরএ) একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বেধে দিতেও নির্দেশ দেয়।

ইসলামাবাদ হাইকোর্টের অপরিণামদর্শী এই রায় জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ২, ৩ এবং ৬ অনুচ্ছেদের ব্যাপক লঙ্ঘন। কোর্টের কর্তৃত্ব ফলাওকারী এই সিদ্ধান্তটি পক্ষপাতদুষ্ট ও অতিরঞ্জিত। হঠকারীতামূলক এই রায়ে অসহিষ্ণুতার প্রতিফলন ঘটেছে। আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র আহমদীয়া বিরোধী মোল্লাদের কাছ থেকে একতরফাভাবে শুনানি গ্রহণ করে আহমদীদের মৌলিক অধিকার হরণকারী

এই রায় তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের ১৯৭৩ সালের সংবিধানের 'ধারা ১০'-এ প্রদত্ত নাগরিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন। অধিকন্তু, জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদে বর্ণিত ৮ ও ১০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ছোট সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণও বটে।

এই সিদ্ধান্তে বিচারপতি সিদ্দিকী এ নির্দেশও দেয় যে, "আহমদী" হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্তিরও কোন অধিকার আহমদীদের নেই, কারণ "আহমদ" নামটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এরও নাম। অর্বাচীনের মত এ রায়ে আরো বলা হয়, আহমদীদের ব্যক্তিগত নাম সাধারণ মুসলমানদের অনুরূপ, তাই নিজেদের পরিচয় আলাদা করতে আহমদীদেরকে নিজ নামের সাথে "মিরজাঈ" বা "গোলাম-ই-মির্জা" যোগ করতে হবে, সেই সাথে মুসলমানদের মত একই রকম নাম ব্যবহারও তাদেরকে বন্ধ করতে হবে।

অবিমৃষ্য এ সিদ্ধান্তটি মানবীয় মূল্যবোধের পুরোপুরি ও প্রকাশ্য এক লঙ্ঘন। আহমদীদের উপর যদি এই সূত্র প্রয়োগ করা হয়; তবে তো পাকিস্তানে প্রত্যেক "সরকারী-মুসলিম"-কে নিজ নামের সাথে অবশ্যই 'মুহাম্মদ' নামটি যোগ করতে হবে, বিশেষ করে যখন তারা বিদেশে যায়। কিন্তু বিচারপতি শওকত আজিজ সিদ্দিকী বা পাকিস্তানের বর্তমান রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, সেনাবাহিনীর প্রধান বা ইসলামী আদর্শবাদের দাবীদার কাউন্সিলর কারোরই নামের সাথে "মুহাম্মদ" নাম যুক্ত নয়; অথচ তারা প্রত্যেকেই সেদেশের "সরকারী-মুসলিম"!

কোর্টের এই নির্দেশটি দেশকে বিচ্ছিন্ন করার এবং রাষ্ট্রের সংহতি, একতা ও জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট।

'আহমদীয়া' সম্প্রদায় আনুগত্য, অহিংসা এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বস্ততা লালনকারী এক সম্প্রদায়ের নাম। আহমদীয়াতের শুরু থেকে কোন দেশে কোনও আহমদীকে দেশবিরোধী বা অযৌক্তিক কোন কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা যায়নি।

আহমদীদেরও রয়েছে একই সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার, যারা প্রগতিশীল অন্য নাগরিকদের সাথে একই জাতিসত্ত্বা হিসেবে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন দেশে বসবাস করে থাকে। রাষ্ট্র তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, চাকুরীর সমান সুযোগ, জীবিকা এবং শিক্ষা প্রদান করতে বাধ্য, যেন তারাও জাতির সেবা করতে পারে।

অতএব, মানবতাকে সুরক্ষিত করতে আর সভ্যতার অগ্রগতির ধারা সচল রাখতে জাগ্রত বিশ্ববিবেককে আহমদী-বিরোধী ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো পাকিস্তানী এই কালো আইনের প্রচার, প্রয়োগ ও বিস্তার রুখে দিতে হবে; নইলে অশুভ-শক্তির দাপট বিশ্বকে করবে ক্ষত-বিক্ষত আর শান্তি হবে সুদূর পরাহত। আল্লাহ্ করুন! শীঘ্রই পাকিস্তানের বোধোদয় হোক, বাতিল করা হোক এই কালো আইন।

(তথ্যসূত্রঃ এশিয়া টাইমস-জুলাই ২৩, ২০১৮)

জীবনলিপিঃ হযরত হাজী আব্দুল করীম সাহেব

[রাবওয়াহ্ থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আল্ ফযল'-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখের সংখ্যায় করাচির মরহুম হযরত হাজী আব্দুল করীম সাহেব এর লেখা নিজ জীবনলিপি পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি।]

হযরত হাজী আব্দুল করীম সাহেব লিখেন, ১৯১৪ সনে অধম সারগোদাতে শিক্ষা গ্রহণ করছিল, বোর্ডিং হাউসে থাকতো এবং নিকটস্থ জামে মসজিদের ইমাম সাহেবকে ফজরের নামাযের পূর্বে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনাতো। আমাদের প্রধান শিক্ষক এবং বোর্ডিং হাউসের সুপারেনটেন্ডেন্ট হাফিয আব্দুল করীম সাহেব যদিও সব নামায এই মসজিদেই পড়তেন, কিন্তু জুমুআর নামায তিনি অন্য কোন জায়গায় গিয়ে পড়তেন। একদিন আমিও তার পিছে পিছে চলে যাই এবং ভিন্ন সেই মসজিদে জুমুআর নামায পড়ি। ফেরত আসার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এই মসজিদে জুমুআর নামায কেন পড়লে? আমি বললাম, আমি আপনার পিছে পিছে চলে এসেছি। তিনি বলেন, এটি আহমদীদের মসজিদ, যাদেরকে কাদিয়ানি বা মির্যায়ী বলা হয়। আমি কাদিয়ানি নই আর না মির্যায়ী, কিন্তু এখানে জুমুআর নামায পড়তে আসার কারণ হল, খুতবায় ইমাম সাহেব কুরআনের খুব সুন্দর তফসীর বর্ণনা করেন। তুমি চাইলে এখানে এসে জুমুআর নামায পড়তে পারো, কিন্তু ভুলেও আবার যেন কাদিয়ানি বা মির্যায়ী হয়ে যেও না।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি একজন কুরআনের হাফিয এবং 'বিএ বিটি' হওয়া সত্ত্বেও আহমদীয়া মসজিদে নামায পড়ে স্বাদ বা আনন্দ পান অথচ তিনি নিজে আহমদী নন আর আমাকেও আহমদী হতে বারণ করেন। দীর্ঘক্ষণ এটি নিয়ে ভাবতে থাকি।

সেদিন রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, একজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বক্তব্য প্রদান করছেন যে, ইসলাম জীবন্ত-ধর্ম। এর খোদা জীবন্ত-খোদা, এর রসূল জীবন্ত-রসূল, এর গ্রন্থ জীবন্ত। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ যুগে এ জন্য প্রেরণ করেছেন, যাতে আমি ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে দেখাতে পারি। আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তি বলেন, ইনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, যিনি এ যুগে ইমাম মাহদী আর প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবী করেছেন।

পরের দিন ফজরের সময় আমি মসজিদে কুরআন শোনানোর জন্য যাই এবং ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সম্পর্কে আপনার মতামত কী? একথা শুনে মৌলভী সাহেব রাগান্বিত হয়ে বলেন, মির্যা একজন চরম কাফির। আমি বললাম, আপনাকে আমি যে কুরআন শোনাতে এসেছিলাম তা শুনিয়েছি। ধর্মীয় জ্ঞান আমি খুব বেশি একটা রাখলেও আমার বিবেক আপনার এই উত্তর গ্রহণে সম্মত নয়। একথা বলে আমি আহমদীয়া মসজিদে চলে যাই।

আহমদীয়া মসজিদে গিয়ে আমি খাদেমকে জিজ্ঞেস করি, কাছাকাছি কোন প্রবীণ আহমদী বাস করে কি-না? তিনি একটি বাড়ির প্রতি ইশারা করেন। আমি সেই বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়লে শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন বয়স্ক ভদ্রলোক দরজা খুলে আমাকে ভেতরে আসতে বলেন। তিনি হালুয়া বানিয়েছিলেন। তিনি বাচ্চাদেরকে ডেকে বলেন, ওঠো, হালুয়া বানানো হয়ে গেছে। অযু করে হালুয়া খেয়ে নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে মসজিদে চল। তিনি বলেন, আমি এদেরকে সকাল সকাল হালুয়া খেতে দেই, যাতে এদের ভেতর নামাযের অভ্যাস গড়ে উঠে। আমাকেও তিনি হালুয়া খেতে দেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার কাছে হযরত মির্যা সাহেবের কোন ছবি আছে কি? তিনি আমাকে একটি ছবি দেখালে আমি সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারি যে, ইনিই সেই বুযূর্গ, যাকে আমি স্বপ্নে বক্তৃতা দিতে দেখেছিলাম।

আমি বললাম, আমি আপনাদের জামাতে যোগ দিতে চাই। তিনি আমাকে দিয়ে বয়আতের দশটি শর্ত পাঠ করান। আমি বললাম, আমি রাজি আছি। তিনি তখন আমাকে একটি পোষ্টকার্ড দেন। এর মাধ্যমে আমি বয়আতের আবেদন লিখে হুযূরের [অর্থাৎ, খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর] খিদমতে পাঠিয়ে দেই। এরপর তিনি আমাকে দূররে সমীন দিয়ে বলেন, আপাতত তুমি এটি পড়তে থাকো।

এরপর আমি ক্লার্ক হিসেবে সেনাবাহীনিতে যোগদান করি এবং আমাকে মহু ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মুসলমান সুবেদার আমার মেজর আনন্দিত হয়ে আমাকে নেওয়ার জন্য ষ্টেশনে আসেন। যাওয়ার পথে তিনি বুঝতে পারেন যে, আমি আহমদী তখন তিনি খুবই দুঃখ পান এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে, যেকোন মূল্যে আমাকে চাকরী থেকে বহিস্কার করবেন। এমনকি বাবুর্চিও আমাকে বলেছে, তুমি কাফির! তাই আমি তোমার জন্য খাবার রান্না করি না। এরপর আমি একজন ভৃত্য রাখি, কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের প্ররোচনায় পড়ে সেও আমার জিনিষ-পত্র নিয়ে সট্‌কে পড়ে। এভাবে যাকেই রাখতাম, সে-ই পালাত। অতএব বেশ কয়েকদিন ছোলাবুট খেয়ে কাটিয়ে দেই। এরপর কখনো ছোলা খেতাম আবার কখনো বাজারে গিয়ে রুটি খেয়ে আসতাম। এসময়ের মধ্যেই কেন্দ্র থেকে

জামাতের বই-পুস্তক আনাই এবং সর্বপ্রথম 'বারাহীনে আহমদীয়া' পড়তে আরম্ভ করি। এই গ্রন্থ পাঠ করার পর আমার ঈমান আরো সুদৃঢ় হয়। সুবেদার মেজর আমাকে ডেকে বলে, আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে, আপনি এই চাকরী ছেড়ে দিন। আমি কর্ণেল সাহেবকে বলে দিব যে, ওনার ফির্কার কোন লোক এই প্লাটুনে নেই, তাই তাকে চাকরী থেকে ছাটাই করা হোক। উত্তরে আমি বলি, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যেখানে দণ্ডায়মান করেছেন, আমি সেখানেই দণ্ডায়মান থাকবো আর স্বেচ্ছায় আমি চাকরী ছাড়বো না। তখন সে রাগান্বিত হয়ে বলে, আমরা আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করেই ছাড়বো। আমিও পুরো আবেগের সাথে উত্তর দেই যে, আমিও আহমদীয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হবো।

পরের দিন আমি অফিসে দরখাস্ত দেই যে, আমার নাম আব্দুল করীম এর পরিবর্তে এ, কে আহমদী হিসেবে পরিবর্তন করে দেওয়া হোক। অতএব, এ বিষয়ে হুকুম জারী করা হয়। ফলে এরপর থেকে সুবেদার মেজরকেও আমাকে মিস্টার আহমদী বলে ডাকতে হতো। কিন্তু এরপর সে আমাকে আরো কষ্ট দিতে আরম্ভ করে। তখন আমি দোয়ার অনুরোধ জানিয়ে মুফ্‌তী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবকে (যিনি আমার স্বদেশী ছিলেন) পত্র লিখি। এরপর তিনি কর্ণেল সাহেবকে পত্র লিখেন যে, আব্দুল করীমের দিকে খেয়াল রাখবেন। জামাতের বিরোধীরা তাকে কষ্ট দিচ্ছে, সঙ্গে তার জন্য ইংরেজী বই-পুস্তকও প্রেরণ করেন।

আমি প্রত্যহ এশার নামাযের পর বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকটি পাঠ করতাম। একদিন চিন্তা করছিলাম, অ-আহমদীরা কেন এই নূরের বিরোধিতা করে আর অন্যরা এই শিক্ষা গ্রহণ করবে তাতেও তারা নারাজ কেন? তখন আমার তন্দ্রা আসে আর আমি দেখি যে, একজন বুযূর্গ আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি আমাকে একটি বই দেন যা কাগজের পরিবর্তে সবুজ রঙের পাতায় লেখা ছিল। আমি এর কয়েকটি পৃষ্টা উল্টিয়ে দেখি যে সেগুলি খালি ছিল। আমি নিবেদন করি, হুযূর! এতে তো কিছুই লেখা নাই। তিনি উত্তর দেন, এতে আপনার জন্য সবকিছু আছে। এরপর আমি আবার আগ্রহভরে পাতা উল্টাতে থাকি তখন আমি দেখি যে, একটি পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে এই শব্দাবলী লেখা আছে **"জগৎ তোমার পিছু লেগে আছে কিন্তু আমরা তোমাকে রক্ষা করবো"**।

আমি দেখি যে, এই বাক্যাবলী থেকে নূরের ফোয়ারা ছুটছে আর আমার দেহে তা প্রবেশ করছে। আমি সেই বুযূর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। সেই বুযূর্গ ছিলেন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)। এরপর আমার তন্দ্রাভাব কেটে যায়। জেগে ওঠার পর আমি সেই নূরের ধারা আমার শরীরে অনুভব করছিলাম।

হযরত মুফ্‌তী মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের চিঠি এবং বই-পুস্তক পাওয়ার পর কর্ণেল সাহেব আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি কি আহমদী? মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব আমাকে লিখেছেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা তোমাকে জ্বালাতন করছে। তিনি আমাকে বইপুস্তক প্রেরণ করেছেন যা অতি উত্তম। তুমি কেন আমার কাছে আগে আসো নি। আমি বললাম, এই বিরোধিতার সময় আমি নামায ও দোয়ায় অনেক স্বাদ ও আনন্দ পেতাম, তাই আমি সেই স্বাদকে নষ্ট করা পছন্দ করি নি।

কর্ণেল সাহেব তার এডজয়েন্ট মিস্টার ক্যাপ্টেন মোরকে ডেকে বলেন, মিস্টার আহমদী এখানে একা আছেন, তাই এরপর থেকে যাকে ক্লার্ক হিসেবে নিয়োগ দিবে, সে যেন ওনার জামাতভুক্ত হন। এরপর সুবেদার মেজরকে ডেকে বলেন, আহমদীরা কি কাফির? সে বলে জ্বি। তখন কর্ণেল সাহেব বলেন, আমরা তাকে (অর্থাৎ আব্দুল করীমকে) অফিসে থাকার জন্য জায়গা করে দিচ্ছি, তাকে হাজিরা, ইত্যাদির জন্য আপনি আর ডাকবেন না।

আমি আল্ ফযল পত্রিকায় চাকরীর নিয়োগ-বিজ্ঞপ্তি দেই এবং আহমদীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আসে এবং আমি তা কাপ্তেন মোর সাহেবকে দিয়ে দেই। এরফলে মির্যা মোহাম্মদ হোসেইন সাহেব চাট্‌ঠী মসীহ্, মোশতাক আহমদ সাহেব এবং প্রয়াত মোহাম্মদ ইব্রাহীম মুলতানী সাহেবও আমার প্লাটুনে চাকরী পেয়ে যান। আমরা চারজন আহমদী একত্রে বসবাস করতাম। এরপর কর্ণেল সাহেব আমাকে দু'মাসের প্রশিক্ষণের জন্য লাহোর প্রেরণ করেন। সেই অফিসের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন শ্রদ্ধেয় হাকীম দ্বীন সাহেব। তিনি দু'মাস আমাকে তার বাড়ীতেই রাখেন আর সেখানে খাওয়া-দাওয়া এবং নামাযেরও সুবন্দোবস্ত ছিল।

কয়েকদিন পর আমাদের প্লাটুন মিশরের উদ্দেশ্যে গমন করে এবং আমাকে সুইজ শহরের হিসাব নিরিক্ষা বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সে সময়ে হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) লন্ডন যাওয়ার নির্দেশ পান। তিনি আমাকে লিখেন, আমি অমুক দিন জাহাজে করে বোম্বে থেকে রওয়ানা হবো। যদি সম্ভব হয় তাহলে সুইজে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। অতএব আমি হযরত মুফ্‌তী সাহেবের জন্য একশ' রুপি পৃথক করে রেখে দেই। বিশ রুপির ফলমুল এবং আশি রুপি দিয়ে কলম কেনার ইচ্ছা ছিল। যেদিন জাহাজ পৌঁছার কথা, সেদিন আমি ফলমুল কিনে আনি। অন্যান্য দোকান বন্ধ ছিল বিধায় কলম আর কিনতে পারি নি। এরপর আমি জাহাজ ঘাটে যাই। হযরত মুফ্‌তী সাহেব সবুজ রঙের পাগড়ী ও শেরওয়ানী পড়ে সেখান দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে ফল-ফলাদি এবং নগদ আশি রুপি উপহার হিসেবে প্রদান করি আর নিবেদন করি, দোকানপাট বন্ধ থাকার দরুন কলম কিনতে পারি নি। আপনি এই অর্থ দিয়ে কলম কিনে নিবেন যাতে ধর্মীয় লেখা-পড়ার কাজে এই অধমও সওয়াব পেতে থাকে। একথা শুনে তিনি বলেন, আমার দোয়া কবুল হয়ে গেছে! আলহামদুলিল্লাহ্।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে মুফ্‌তী সাহেব জানান, সমুদ্র যাত্রায় আমার সমুদ্রপীড়া হয়ে গেছে, এজন্য আমি জাহাজের নাবিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই সফরকে সংক্ষিপ্ত করার কোন উপায় আছে কি-না? তিনি বলেন, হ্যাঁ আপনি ফ্রান্স থেকে ট্রেনে করে লন্ডন যেতে পারেন। এতে আপনার কয়েকদিনের সফর বেঁচে যাবে। সেই ট্রেনের টিকেট কাটার জন্য হযরত মুফ্‌তী সাহেবের আশি রুপি প্রয়োজন ছিল। জাহাজে যেহেতু চেক চলে

না তাই নাবিক আশি রুপি নগদ চেয়েছে। হযরত মুফ্‌তী সাহেব বলতে আরম্ভ করেন, আমি দোয়া করেছিলাম, হে খোদা! আমি তোমার ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, তাই আমাকে যেকোন ভাবে নগদ আশি রুপি দান করো। আর আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার এই দোয়া কবুল হয়েছে। এখন আপনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই পরিমাণ অর্থ পাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বিলাত থেকে ফিরে আসার সময় হযরত মুফ্‌তী সাহেব তাঁর ছেলে মুফ্‌তী আব্দুস সালাম সাহেবের রুখস্‌তীর (বিবাহের) জন্য শাহজাহানপুর গমন করেন। তখন সেখানকার মিশন হলে তাঁর একটি বক্তৃতার আয়োজনও করা হয়। প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় স্বয়ং উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। বক্তব্যের বিষয় ছিল, My Experience in America অর্থাৎ, আমেরিকায় আমার অভিজ্ঞতা। এই বক্তৃতায় তিনি সেই দোয়া কবুল হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন এবং আরো বলেন, যে যুবক আমাকে আশি রুপি প্রদান করেছিল, সে এখন শ্রোতাদের মাঝে উপবিষ্ট আছে। আমি তাকে বলছি, সে যেন দাঁড়িয়ে এই ঘটনার সত্যায়ন করে। অতএব আমি তখন দাঁড়িয়ে এই বিষয়ের সত্যায়ন করি বা এর অনুকূলে স্বাক্ষ্য প্রদান করি।

আমি হযরত মুফতী সাহেব (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি। তিনি বলেন, আমার বয়স বেশি। আমি তবলীগের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। জানি না জীবিত ফিরে আসবো কি-না? তাই আমি আমার ছেলে আব্দুস সালাম মুফ্‌তি নিকাহ্-র এলান আমার রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী-র খেদমতে পেশ করে দিই। কনে ছিল আমার একজন সুহৃদ বাবু মুহাম্মদ আলী খান সাহেব শাহজাহানপুরীর মেয়ে। তার চারজন কন্যা ছিল। কিন্তু আব্দুস সালামের বয়সের নিরিখে তার মেঝ মেয়েটি উপযুক্ত ছিল। তাই তার সাথেই এর নিকাহ্ হয়। কিন্তু সমাজে বড় বোনের আগে ছোট বোনের বিয়ে হওয়াকে দোষের মনে করা হত, তা সত্ত্বেও সুহৃদ বাবু সাহেব আমার সম্মানের কথা ভেবে মেনে নিয়েছিলেন বটে, তবে একই সঙ্গে বলেন, আমার বড় কন্যার বিয়ের ব্যবস্থাও আপনি কোন উপযুক্ত স্থানে করিয়ে দিন। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আর আমার মাথায় তোমার কথা আসছিল। ওনার সবক'টি মেয়েই নামায-রোযায় অভ্যস্ত ছিল। তাই তুমি তোমার পিতাকে লিখে জানাও যদি তিনি পছন্দ করেন তাহলে আমাকে জানিও। আমি নিকাহ্‌র ব্যবস্থা করবো। একইসঙ্গে তিনি বলেন, তুমি তোমার একটি ছবি বাবু সাহেবকে পাঠিয়ে দাও আর লিখে দাও যে, মুফতী সাহেবের নির্দেশে আপনাকে এই ছবি পাঠানো হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমি লন্ডন পৌঁছে বাবু সাহেবকে লিখে দিবো যে, এই ছেলের সাথে আপনার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। অতএব আমি তাঁর নির্দেশ পালন করি এবং ১৯১৭ সালের ১৭ই আগষ্ট সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ানে আমার বিয়ের এলান করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি ১৯১৯ সনে হিন্দুস্থানে ফিরে আসি এবং এপ্রিল মাসে বউ তুলে আনার উদ্দেশ্যে শাহজাহানপুর যাই। সেখানে জামাতের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে মিশরে কীভাবে তবলীগ করতাম তা বর্ণনা করি। সেখানে আমার দশ দিন থাকার ইচ্ছা ছিল এবং এজন্য একটি বাড়ীও ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। রুখসাতানার পর আমার স্ত্রীকে সেই বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া হয় আর শাহাজাহানপুরের আহমদীরা আমাকে সেখানে ছেড়ে আসেন আর এই বন্ধন কল্যাণময় হওয়ার জন্য দোয়া করেন।

নতুন বিয়ে হয়েছিল মাত্র তারপরও আমার স্ত্রী তার সমুদয় গহনা চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। ১৯২৪ সনে আমি কাস্টমস বিভাগে Preventive অফিসার ছিলাম, তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পক্ষ বিশেষ চাঁদার তাহরীক করা হয়। অধম তার তিন মাসের বেতন এ খাতে চাঁদা হিসেবে প্রদানের ওয়াদা করে। এরপরই আমার সেই চাকরী চলে যায় এবং আমি বেকার হয়ে পড়ি। আমি আমার স্ত্রীকে বলি, তিন মাসের বেতন চাঁদা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছি তাই তুমি যদি সহযোগিতা কর তাহলে আমরা আমাদের ঘরের জিনিষপত্র নিলাম করে সেই অর্থ চাঁদা হিসেবে দিতে পারি। তখন আমার বিয়ের বয়স হয়েছিল পাঁচ বছর। আমার স্ত্রী সম্মতি দিলে আমি ঘোষণা করে দেই যে, চাঁদা দেওয়ার জন্য আমি আমার গৃহসামগ্রী নিলাম করবো, অতএব শুধুমাত্র বিছানা-বালিস ও কয়েকটি আবশ্যক থালা-বাসন ছাড়া সবকিছু নিলাম করে আমি আমার চাঁদা পরিশোধ করি। পালঙও নিলাম করে দিয়েছিলাম। সেদিন রাতে আমরা দু'জন চাঁটাই পেতে ঘুমাই। ঘরের জিনিষিপত্র নিলাম করার পর আমার বেকারত্বের কারণে আমার স্ত্রী লেডি সুপারভাইজারের পরামর্শে চাকরী করতে আরম্ভ করে। তাকে আমাদের ঘরের কাছে মেয়েদের স্কুলে চাকরী দেওয়া হয়। একজন পাঞ্জাবী, মহিলা ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তিনি যখন জানতে পারেন যে, আমার স্ত্রী উত্তর প্রদেশের আর আমি পাঞ্জাবী তখন তিনি এর কারণ জানতে চান। উত্তরে আমার স্ত্রী বলেন, আহমদীদের বিয়েশাদী নিজেদের জামাতের মধ্যেই হয়ে থাকে। তখন সেই মহিলা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে অসম্মান করে কথা বলে। এমনটি দেখে আমার স্ত্রী একথা বলে ঘরে চলে আসেন যে, আমি এমন চাকরীর ওপর অভিসম্পাত বর্ষণ করি যেখানে আমার প্রিয় মনিবকে গালী দেওয়া হয়। প্রধান শিক্ষিকা তৎক্ষণাৎ উপরে রিপোর্ট করে দেয় যে, একজন শিক্ষিকা পালিয়ে গেছে। লেডি সুপারভাইজার ছিলেন পারস্য বংশীয়। রিপোর্ট পেয়ে তিনি আমাদের বাড়ীতে আসেন। আমার স্ত্রী তাকে বলেন যে, উনি আমার মনিবকে গালী দিয়েছিলেন, তাই আমি চলে এসেছি। একথা শুনে লেডি সুপারভাইজার আমার স্ত্রীকে অন্য আরেকটি স্কুলে বদলী করে দেন।

হাজী করীম সাহেব বলেন, আমি নিজের সম্বন্ধে আরো দু'টি ঘটনা লিখছি। যদ্দারা এটি প্রমাণিত হবে যে, খোদা তা'লার এই যে প্রতিশ্রুতি, "আমরা তোমাকে রক্ষা করবো।" তা কত মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে। তখন আমি সুইজ-এ সেনাবাহীনির ক্যাম্পে অবস্থান করছিলাম আর সেই ক্যাম্পে কয়েকশ' ক্লার্ক ছিল। ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে আমি বিকাল ৪টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত বাইরে থাকার

পাশ নিয়েছিলাম। প্রতিদিন ৫/৬ ঘন্টা তবলীগ করতাম। আমার তাঁবুর সামনে আমি একটি মসজিদ বানিয়েছিলাম আর সেখানে আমি নিয়মিত আযান দিতাম এবং নামায পড়তাম। সেখানে আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, কেউ যদি পবিত্র কুরআন পড়া শিখতে চায় তাহলে আমার কাছ থেকে শিখতে পারে। তখন সাগের খান নামী একজন ক্লার্ক আমার কাছ থেকে কুরআন পড়া শেখে এবং আমার তবলীগে আহমদী হয়ে যায়। এরপর তাকে তোপখানায় বদলী করা হয়। সেখানে তিনি একজন কুরআনে হাফেয জমাদারকে এক ধর্মীয় বিতর্কে বা মুনাযেরায় পরাস্ত করেন। তখন সে জানতে চায়, তুমি কার কাছে কুরআন পড়া শিখেছ? উত্তরে তিনি আমার নাম বলেন। তখন হাফেয সাহেব ছুটি নিয়ে সুইজ-এ আসে এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে বলে, আমি আহমদীর সাথে মুনাযেরা করবো, তোমরা আমাকে লিখে দিও যে, আহমদী হেরে গেছে যাতে আমি সেখানে ফিরে গিয়ে সাগের খানকে বলতে পারি যে, আমি তোমার ওস্তাদকে পরাস্ত করে এসেছি। এরপর কয়েকজন অ-আহমদী ক্লার্কের সাথে সে আমার তাঁবুতে আসে এবং বিভিন্ন দলিল-প্রমাণ দেওয়া সত্ত্বেও সে বলে, আহমদী সাহেব! আপনি হেরে গেছেন। তখন পূর্ব-পরিকল্পনা মোতাবেক তার সঙ্গীরা আমি হেরে গেছি বলে লিখে দেয়।

এরপর এখানে একজন পাদ্রীর সাথে আমার মুনাযেরা হয় আর তাতে পাদ্রী পরাস্ত হওয়ার পর ক্যাপ্টেন রায়েট এর নির্দেশে আমার কোর্ট মার্শাল হয় এবং আমাকে আমার তাঁবুতে নযর বন্দী করে রাখা হয়।ক্যাপ্টেন জজ সাহেবকে বলে দিয়েছিল যাতে আমাকে ছয় মাসের কারাশাস্তি দেওয়া হয়। জজও একজন খ্রিস্টান ছিল আর তাকে ক্যাপ্টেন রায়েট আমার ব্যাপারে বলেছিল যে, এই লোক খিস্টানদের শত্রু এবং পাদ্রীর সাথে আমার বিতর্কের ফলাফলও সে তাকে জানিয়েছিল।

এ ঘটনার দু-আড়াই মাস পূর্বে আমাদের কর্ণেল সাহেব পদোন্নতি পেয়ে ব্রিগেডিয়ার হয়ে গিয়েছিলেন আর আমি তাকে মোবারকবাদ জানিয়ে তারবার্তা প্রেরণ করেছিলাম কিন্তু কোন উত্তর পাই নি।

যাহোক, যখন কোর্ট মার্শাল আদালতের পক্ষ থেকে আমাকে এই বলে চার্জ শিট দেওয়া হয় যে, অমুক দিনের মধ্যে এর উত্তর দাও এবং তোমার স্বাক্ষীদেরকে নিয়ে আদালতে উপস্থিত হও। আদালতের রায়ের একদিন পূর্বে ক্যাপ্টেন রায়েট অফিসের সবাইকে জানিয়ে দেয় যে, আগামী কাল মিষ্টার আহমদীর ছয় মাসের কারাশাস্তি হয়ে যাবে। সেদিন রাতের বেলা ক্যাম্পে কয়েকজন অ-আহমদী ক্লার্ক ভাই আলী হোসেন সাহেবকে কটাক্ষ করে বলে, আগামীকাল আপনার আহমদী বন্ধু I.M.S.M (Indian Meritorious Service Medal)-এর স্বতন্ত্র মেডেল পাবে। একথা শোনামাত্রই তিনি আমার কাছে ছুটে এসে বলেন, অ-আহমদীরা আমাকে ভৎর্সনা করছে। আমি তাকে বললাম, এখনই মেসে আসো আর সবার সামনে একথা ঘোষণা করে দাও যে, মিষ্টার আহমদী বলছে, আমার মহাপরাক্রমশালী খোদা চাইলে আমাকে I.M.S.M-এর তমগা বা মেডেল দিতে পারেন। আলী হোসেন সাহেব ইতস্তত করছিলেন কিন্তু আমার জোর দেওয়ার কারণে তিনি সেখানে যান এবং যেমনটি আমি বলেছিলাম সেভাবেই সবার সামনে ঘোষণা করেন। একথা শুনে বিরুদ্ধবাদী ক্লার্করা হাসতে আরম্ভ করে আর বলে, আগামীকাল তার ছয় মাসের জেল হতে যাচ্ছে আর সে I.M.S.M-এর তমগা বা মেডেল পাওয়ার অলিক-স্বপ্ন দেখছে। আলী হোসেন সাহেব ফিরে এসে বলেন, তারা এভাবে হাসি-ঠাট্টা করছে। আমি তাকে বললাম, বুযুর্গরা বলেছে, **"বিপদে খোদার দ্বারস্থ হও"**– তাই আমি আজ সারারাত মসজিদে কাটাবো। সম্ভব হলে আপনিও দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ্ আমার অপরাধ ক্ষমা করেন আর সেই সত্তার কাছে যে জিনিষের প্রত্যাশা করেছি, তা যেন তিনি পূর্ণ করেন।

পরের দিন আমি আদালতে উপস্থিত হই আর ক্যাপ্টেন রায়েটও তার স্বাক্ষীদেরকে নিয়ে আসেন এবং জজকে বলেন, মিস্টার আহমদীকে আমি তিনবার ডেকে পাঠাই কিন্তু সে আসে নি। স্বাক্ষীরাও এ কথার স্বাক্ষ্য দেয়। জজ সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করেন, উনি যা বলছেন তা কি সত্য? আমি বললাম জ্বি হাঁ, কিন্তু তার নির্দেশ পালন করা মানবীয় ক্ষমতার উর্ধ্বে ছিল। কেননা, আমি পাঁচ মিনিটের দূরত্বে থাকি আর ক্যাপ্টেন সাহেব সাধারণত তার কাছের হেড ক্লার্ককে ত্বরিৎ ডেকে নিতেন আর তিনি এক মিনিটেই তার কাছে পৌঁছে যেতেন। তিনি স্বাক্ষী তলব করেন কিন্তু আমার পক্ষের কোন স্বাক্ষী ছিল না আর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কেউ স্বাক্ষী দিতেও চাইতো না। একথা শুনে জজ সাহেব বলেন এবং লিখেন, আমি তোমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করছি। এবং 'এবং' শব্দটি তার মুখে ছিল, তখনই টেলিফোনের রিং বাজতে আরম্ভ করে। অপরপ্রান্ত হতে টেলিফোনকারী বলেন, তোমার আদালতে মিষ্টার আহমদীর বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চলছে কি? জজ বলে, জ্বি হুযূর! আমি এখনই তার রায় দিচ্ছি। টেলিফোনকারী বলেন, রায় দিও না বরং নথিপত্র নিয়ে আমার কাছে আসো।ক্যাপ্টেন রায়েট নিশ্চিত ছিল যে, জজ ফিরে এসেই তার রায়ের বাকী অংশ ঘোষণা করবেন যে, **"আমি তোমাকে ছয় মাসের শাস্তি দিচ্ছি"**। তাই সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, মিষ্টার আহমদী, আমার দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, এখন তুমি জেলে যাচ্ছ। আমি উত্তেজিত হয়ে বলি, **'তুমি ভুল বলছ' তুমি এই পৃথিবীতে একটি মৃত কীট মাত্র কিন্তু আমার খোদা জীবন্ত খোদা। আমার সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি লাঞ্ছিত হবে।** ইতোমধ্যে জজ সাহেব ফিরে আসেন এবং রায় প্রদান করার পরিবর্তে আমাদের দু'জনকে বলেন, জেনারেল শূট সাহেব আপনাদের উভয়কে ডাকছেন।

আমরা উভয়ে সেখানে গেলে জেনারেল সাহেব প্রথমে আমাকে ডেকে পাঠান এবং আমার কাছে জানতে চায় যে, আমি ব্রিগেডিয়ার কিড সাহেবকে চিনি কি-না? আমি বললাম, খুব ভালোভাবে চিনি। তখন তিনি বলেন, ওনার কাছ থেকে তারবার্তা এসেছে যে, তিনি আপনাকে তার ব্রিগেডে চীফ ক্লার্ক হিসেবে পেতে চান এবং আপনাকে মাসিক একশ' রুপি

অতিরিক্ত ভাতাও প্রদান করবেন। আপনি কি সেখানে যেতে রাজি আছেন? আমি সম্মতি জানালে তিনি মেজরকে ডেকে বলেন, ওনাকে পদোন্নতির আদেশপত্র দিয়ে দাও।আর ওনাকে দু'জন আর্দালী এবং রেলের পাশ দিয়ে দাও আর কিড সাহেবকে তারবার্তা পাঠাও যে, মিস্টার আহমদী আসছেন। আমি পদোন্নতির কাগজপত্র নিতে চলে যাই আর এই ফাকে জেনারেল সাহেব ক্যাপ্টেন রায়েটকে ডেকে ভৎর্সনা করে বলেন, আমাকে জজ বলেছে, পাদ্রীদের কথায় তুমি একজন ক্লার্ককে ছয় মাসের কারাশাস্তি প্রদানের চেষ্টা করেছ তাই আমি তোমার Staff Qualifications বাতিল করছি আর তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করছি।

যাহোক, আমি পদোন্নতির নির্দেশ এবং ক্যাপ্টেন-এর অবনতির নির্দেশ নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি। সেখানে অফিসের ক্লার্করা দাঁড়িয়ে ছিল। কি সিদ্ধান্ত হয়েছে তা তারা আমার কাছে জানতে চায়। আমি বললাম, আমি হেড ক্লার্ক থেকে চীফ ক্লার্কের পদোন্নতি পেয়েছি এবং মাসিক একশ' রুপি অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হবে। একথা শুনে তারা মনে করে যে, শাস্তি পাওয়ার কারণে মিষ্টার আহমদী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এরপর তারা ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলে সে অত্যন্ত ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, জেনারেল শূট আহমদীকে প্রমোশন দিয়ে দিয়েছে আর আমার মাসিক দুশ' রুপি ক্ষতি করে দিয়েছে।

এরপর ক্যাপ্টেন রায়েট ব্রিগেডিয়ার কিড সাহেবকে এই বলে একটি চিঠি লিখে পাঠায় যে, মিষ্টার আহমদী খ্রিস্টানদের ঘোর শত্রু। আর আমার অবনতির কারণ মূলত এটিই, তাই আপনি ওকে শাস্তি দিন।

ব্রিগেডিয়ার সাহেব যখন আমার আগমনের তারবার্তা পান তখন চৌদ্দ দিনের জন্য তাকে কোন একটি বিশেষ কাজের জন্য অন্যত্র ডেকে পাঠানো হয় এবং তিনি যাওয়ার সময় ব্রিগেডিয়ার মেজর উইলসনকে বলে যান যে, মিষ্টার আহমদী আসছে, আমি না আসা পর্যন্ত তার যেন কোন কষ্ট না হয়। পরের দিন আমি সেখানে পৌঁছি আর ক্যাপ্টেন রায়েটের পত্রও পৌঁছে আর তা পাঠ করে ব্রিগেডিয়ার মেজর সাহেব খুবই বিস্মিত হন যে, এখন তিনি কি করবেন। তিনি চৌদ্দ দিনের জন্য আমাকে চীফ ক্লার্কের দায়িত্ব বুঝিয়ে না দিয়ে ক্যাপ্টেনের একজন স্টাফকে চৌদ্দদিন ছুটি দিয়ে আমাকে তার স্থলে কাজ করতে নির্দেশ দেন।

চৌদ্দদিন পর কিড সাহেব ফিরে এলে উইলসন সাহেব তাকে ক্যাপ্টেন রায়েটের চিঠিটি দেন, কিন্তু তিনি তা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং বলেন, 'মিস্টার আহমদী' এমন নয়।এরপর আমাকে চীফ ক্লার্কের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আমি দেখলাম, সেখানে আগেই তিনজন অতিরিক্ত ক্লার্ক আছে আর আমার আসার কারণে তা চারজনে পরিণত হয়েছে। আমি কিড সাহেবকে বললাম, আপনি আমাকে এখানে কেন ডেকে এনেছেন? আপনার কাছে তো আগেই তিনজন ক্লার্ক অতিরিক্ত আছে। তিনি বলেন, আপনি তিন মাস পূর্বে আমাকে মোবারকবাদ দিয়ে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারি নি। তাই আমার মনে হল, মিস্টার আহমদী'র কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত আর এ জন্যই আমি জেনারেল শূট সাহেবকে তারবার্তা প্রেরণ করেছিলাম। এখন আপনি এসে গেছেন, তাই মোবারকবাদের কারণে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি বললাম, এসব কিছু আল্লাহ্‌রই হাতে, তিনিই সব কিছু করেছেন। এরপর আমি তাকে কোর্ট মার্শাল সংক্রান্ত পুরো ঘটনা খুলে বলি এবং এও বলি যে, **আমি আপনার জন্য চল্লিশ দিন দোয়া করবো। কেননা, আপনিও খোদার নির্দর্শনের একটি অংশ।**

এর দু'মাস পর তিনি Distinguished Service Order এর সম্মানে ভূষিত হন। আমি তাকে মোবারকবাদ দিলে তিনি বলেন, মিস্টার আহমদী! এটি তোমার দোয়ার ফলেই হয়েছে। কেননা, এই চৌদ্দ দিনে আমি তেমন কোন বিশেষ কাজ করিনি। আমি বললাম, নিঃসন্দেহে ইসলামের খোদা জীবন্ত খোদা। তিনি তাঁর অধম বান্দার দোয়া কবুল করেন।

এরপর কিড সাহেব গোপনে আমার জন্য সুপারিশ করেন আর কমান্ডার ইন চীফ আমাকে I.M.S.M (Indian Meritenius Service Medal)-এর তগমা বা সম্মানে ভূষিত করেন। সরকারী গেজেটের মাধ্যমে তা ঘোষণাও করা হয়। সেই ব্যাজ পরে আমি কয়েকদিন পর ছুটিতে 'সুইজ' যাই এবং বিরুদ্ধবাদী ক্লার্করাও তা দেখে, যা আমার সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে দিয়েছিলেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

(সূত্র : আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ই জানুয়ারী, ২০১৮ তারিখের 'আল্ ফযল ডাইজেষ্ট' থেকে সংগৃহীত)

আহমদ তারেক মুবাশ্বের
বাংলাডেস্ক, লন্ডন

ঈদুল আযহা ও প্রসঙ্গ কথা

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

বিশ্ব মুসলিম উম্মা গত দেড় হাজার বছর অবধি প্রতি বছর ১০ জিলহজ্জ তারিখ অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে ঈদুল আযহা তথা কুরবানীর ঈদ উদযাপন করে আসছে। এই ঘটনার সূত্রপাত মূলত গত ৪ হাজার বছর পূর্ব হতেই। সুদূর অতীতে গিয়ে এর বাস্তবতার তথ্য তালাশ না করে ইসলামের শুরু থেকেই পালিত এই উৎসব ঈদুল আযহার তাৎপর্য নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করব।

চান্দ্র জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ আমরা ইসলাম অনুসারী মুসলমানগণ পরম প্রফুল্লতায় অত্যন্ত ঘটা করে সকালে দুই রাকাত নামায আদায় করে আমাদের সামর্থানুযায়ী গরু, ছাগল, ভেড়া কিংবা উট, দুম্বা (চার পা ওয়ালা হালাল পশু) কুরবানী দিয়ে ঈদ উদযাপন করে থাকি। বিশ্ব মুসলিমসহ মানুষের কল্যাণ ও ইসলামের বিজয় কামনায় অন্তরের অন্তস্থলের ভালবাসায় দোয়া প্রার্থনা করি ও অন্যের প্রতি মহব্বতের টানে পরস্পরে মিলে কোলাকুলি করে ঈদ তথা খুশীর পর্বানুষ্ঠান শেষ করি। প্রণিধানযোগ্য কথা হলো এই যে, মূলত এতদকয়টি অনুষ্ঠান বা কর্মসম্পাদন করাতেই ঈদুল আযহার তাৎপর্য নিহিত নহে। এমন কিছু করার ভিতরই বিশেষ এই দিনের উদ্দেশ্য ও মর্মার্থ উল্লেখযোগ্য নয়। প্রকারান্তরে যে সাহসকে কেন্দ্র করে আমাদের নবীজী (সা.) এই ঈদ তথা কুরবানীর প্রথা প্রবর্তন করেছেন তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ত্যাগের অসাধারণ এক শিক্ষা যা প্রতি বছর এই দিনে এই কর্মকান্ডগুলি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তদ্রুপ গুণের ও মানের ত্যাগ তথা উৎসর্গ করার মাঝেই এই ঈদ পালনের সার্থকতা। নচেৎ এই উৎসব উদযাপন লৌকিকতা বৈ আর কিছুই নয়।

মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের (৩৭:১০৩-১০৬) নং আয়াতে বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, "হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি যেন তোমাকে যবহ করছি। সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার অভিমত কি? ছেলে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি যা আদিষ্ট হয়েছ, তা-ই কর। ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের মধ্যে পাবে'। অতঃপর যখন তারা উভয়ে (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করল পিতা ইবরাহীম পুত্র ইসমাঈলকে যবহ্ করার জন্য কপালের ওপুর উপুর করে শোয়াল, 'তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছ'। নিশ্চয় আমরা এ রূপেই সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি'।

আমরা সবাই অবশ্যই জানি যে, পুত্র কিংবা কন্যা যা-ই হোক না কেন এ সম্পদ পিতামাতার অসম্ভব আদরের দুর্লভ এক সম্পদ। যে সম্পদের সম্মান পৃথিবীর তাবৎ সম্পদের সমন্বয়েও হওয়া সম্ভব নয়। এমনই এক অনন্য সাধারণ সম্পদকে এক পিতা কেবলই স্বীয় খোদার ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। খোদার অভিপ্রায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয় সম্পদের উর্ধ্বে স্থান দিতে তিনি মোটেই কুণ্ঠাবোধ করছিলেন না। যদি তখন তিনি (হযরত ইবরাহীম) তাঁর খোদার পক্ষ হতে এ কাজের বারণ আদেশ না পেতেন তবে তখন তিনি তা-ই করতেন যা তিনি (আ.) তাঁর খোদার আদেশ নিমিত্তে সেই ক্ষণে করতে যাচ্ছিলেন। ঈদের প্রথা যদি আজ অবধি অনুরূপই থাকতো তবে সেই ঈদ আমাদের জন্য কত বিষাদময় হতো তা কী কল্পনা করা যায়? আমরা এতে কে কতটুকুন সফলকাম হতাম সে বিষয়ে বিরাট এক প্রশ্নের অবকাশ থাকে। তবে এতে মোটেই সন্দেহ নেই যে, এ ঈদ পালন আমাদের জন্য এরূপ শিক্ষা ও ত্যাগ করার তাগিদই করে থাকে। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে এরূপ আদর্শের ত্যাগ স্বীকার ও লালন করাতেই রয়েছে ঈদের সার্থকতা।

তবে এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করার দাবী রাখে–

এক– কেমন সে পিতা যিনি কিনা খোদার আদেশ পালনের তাগিদে ইতস্তত না করে, বিকল্প কোন ভাবনা না ভেবে স্বীয় ছেলেকে কতল করার মনস্থির করেছিলেন?

দুই– কেমন সে পুণ্যবতী মা যিনি ছেলেকে ঈদৃশ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, খোদার পথে কুরবানী হতে গেলে কখনো কোন প্রশ্নের অবতারণা করা যাবে না।

এমন ক্ষেত্রে পূর্ণ ধৈর্যশীল হয়ে 'শুনলাম এবং মান্য করলাম' এর মধ্যেই রয়েছে উন্নত পর্যায়ের সাধুতা।

তিন– কেমন সে স্ত্রী যিনি তাঁর স্বামীর ঈপ্সিত খোদাপ্রেমকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়ার খাতিরে স্বস্নেহে লালিত আদরের দুলালকে উৎসর্গ করে দিতে গিয়ে তিলার্ধ পরিমাণ দ্বিধা করেন নি?

চার– কেমন সে সুশিক্ষিত পুত্র যেকিনা পিতার ওপর খোদা প্রদত্ত আদেশকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বীয় শির ছুরির নীচে সোপর্দ করে দিতে গিয়ে কোন প্রশ্নের উদ্রেক করেন নি!

এরই নাম কুরবানী। এমন স্বভাবের কুরবানীর চাহিদা নিয়েই প্রতি বছর আমাদের দ্বারে আসে ঈদুল আযহার ডাক। এমন নজীর বিশিষ্ট কুরবানী উপস্থাপনই হলো এই ঈদের তাৎপর্য। এরই নাম ইসলাম তথা আত্মসমর্পণ। এরূপ গুণ ও মানের পিতা, মাতা ও সন্তান হওয়াই হলো এই ঈদের শিক্ষা ও জোর তাগিদ। ইসলাম আজ এমন গৌরবমন্ডিত পিতা চায়, মাতা ও সন্তান চায়। ইসলামকে বিশ্বব্যাপী বিজয়ী করতে হলে অনুরূপ সুমহান চরিত্রের যোদ্ধা হওয়াই আমাদের দরকার। কিন্তু হায়! কোথায় সে মহোৎকৃষ্ট গুণের কুরবানী আর কোথায় সে খুনোখুনি। ইসলাম অনুসারী সন্তানেরা যেখানে ধর্মের প্রেমে ছুরির নীচে শির দেওয়ার কথা ছিল সেখানে তাদের কতক আজ হাজার হাজার নিরীহ মানুষের শিরোচ্ছেদ করছে। যেখানে শিশুদের স্নেহ মায়া দেওয়ার কথা ছিল সেখানে কিনা তারা আজ তাদের শ্লীলতা হানী করছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা পৃথিবীতে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করো না" (২:৬১)। অথচ কতক নামধারী মুসলমান আজ এর বিপরীত কর্ম সাধন করছে। খুশীর ঈদ আজ রক্তস্নাত হচ্ছে। ঈদের দিনেও পশুর মত করে মানবদেহের রক্ত প্রবাহিত করা হচ্ছে। নামধারী মুসলমান সন্তানেরা যেভাবে রক্তের প্লাবন বইয়ে ইসলামের তথাকথিত সেবা করার নামে শ্লোগান দিচ্ছে, অশোভন কর্মকান্ড সাধন করছে তাতে করে ইসলাম মানবপ্রেমী ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠিত হবে না। বরং অত্যাচারী ভয়ংকর উগ্ররূপ দেখে তদীয় শিক্ষাকে মানুষ ঘৃণার সাথে উপেক্ষা করবে। এর ডাক শুনে মানুষ প্রাণ ভয়ে প্রাণে বাঁচার চেষ্টায় পালিয়ে বেড়াবে। ভিন্ন ধর্মের লোকেরা মূলত এমনই করছে।

কুরবানীর ঈদ উদযাপনকারী হে আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ! আসুন, আমরা কুরবানীর এই ঈদ পালন করতে গিয়ে কুরবানীর তাৎপর্যকে উপলব্ধি করি, অনুধাবন করি। কুরবানীকে লক্ষ্য করে কুরআন প্রদত্ত শিক্ষাকে প্রতিজনের জীবনে বাস্তবায়ন করার প্রয়াস নেই। এই ঈদ তার মর্যাদাকে যেভাবে উন্নীত করতে চায় সেই বাসনায় আমরা তাকে মর্যাদামণ্ডিত করি। তার শান ও মানকে মহিমান্বিত করি। আমরা যেন তার মূলকে ছেড়ে দিয়ে ভুলকে অনুসরণ করে প্রহসন না করি। আমরা শতধা বিভক্ত হয়ে শক্তির দম্ভ ও ঈর্ষা নিয়ে পরস্পরকে খুন করে ঈদের দিনের পশুর দেহের রক্তসম প্লাবন বইয়ে যেন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি না করি। মায়ের কোলের শিশুটি যেন মায়ের ক্রোড়ে নিরাপদ থাকে।

এ যুগে কুরআন ও আঁ হযরত (সা.) এর বর্ণনানুসারে ইসলামের সেবার জন্য ঐশী জগত হতে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এসেছেন, যাঁকে স্বর্গ প্রশাসন যুগ ইমাম ও ইমামে মাহদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থাপনায় রয়েছে ইসলামের রুগ্নতার চিকিৎসা। তবেই ইসলাম সগৌরবে পূর্ণ সুস্থতায় জীবন্ত ধর্ম হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে। তরতর তার শান ও মান পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসারিত হবে। ধর্মের প্রাণ খলীফা মসনদে বসা আছেন। তাঁর নির্দেশনা অনুসরণ করত: আসুন আমরা জিঘাংসার অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে দোয়ার অস্ত্রকে পাথেয় করে এক নেতা এক ধর্মের শান্তির বাণী নিয়ে রুগ্ন ইসলামের সেবায় ব্রতী হই। এমতাবস্থায় পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যেকিনা ইসলামের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। পরিশেষে আমাদের সবাইকেই অবশ্য অবশ্যই এমনটি করতে হবে। তৎপর ঈদ আমাদের জন্য হবে মহাকল্যাণময় ও আনন্দঘেরা উৎসব। মানুষের জীবন হবে নন্দিত সুন্দর। যিনি শুনবেন তার জীবন হবে সার্থক। অন্যথায় এর পরিণাম হবে বিষাদময়। এবারে খোদা প্রদত্ত সতর্কবাণী লিখে লেখা শেষ করছি। মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন– আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত কর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ (কারো ওপর) কোন অবিচার করা হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। এবং তুমি তাদেরকে সে আসন্ন (কিয়ামত) দিন সম্বন্ধে সতর্ক কর, যখন হৃদয়গুলি অন্তর্নিহিত দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় কুণ্ঠাগত হবে। তখন যালেমদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কোন শাফায়াতকারী (সুপারিশকারী) হবেনা যার শাফায়াত গ্রহণ করা যেতে পারে" (৪০:১৮-১৯) ঐশী জগত কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট সতর্ককারী ঋষী পুরুষকে অস্বীকার করার পরিণাম কখনো শুভ হয় নি। তা শাশ্বত সত্য। সুতরাং হে পৃথিবীবাসী! বিষয়টি প্রণিধান করুন। আবারও সেই একই বিষয়ে একই সত্য আপনাদের সামনে উপস্থিত। হে বন্ধুরা! বাহুবল কিংবা তাচ্ছিল্যের সাথে নয়, দম্ভ ও বিদ্যার অহংকারেও নয়, কুরআন ও হাদীসকে বিশ্লেষণ পূর্বক এর আলোকে এই সত্যকে পরখ করুন। নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া প্রত্যাদিষ্ট মহান এ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করলে আপনারা অবশ্যই খোদার অনুকম্পার রাজ্য হতে প্রত্যাখ্যাত হবেন। উল্লেখিত খোদার বাণীর সার ইহাই।

হে খোদা! তুমি আমাদের প্রতি রূঢ় হয়ো না বরং অনন্ত অনুকম্পাশীল হও। আমাদের তোমার করুণার ভাগীদার করো।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর ৮৭)

বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার বন্ধের জন্য আহ্বান (১১)

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবীকারকের সত্যতার প্রমাণঃ

(৩) হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রদর্শিত ঐশী নিদর্শনাবলীর দৃষ্টান্তঃ

এখন আমরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য কয়েকটি বিশেষ ঐশী নিদর্শন সম্পর্কে উল্লেখ করবো। এই সকল নিদর্শনাবলী হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এমন একজন দাবীকারক যিনি খোদা তা'লা কর্তৃক মনোনীত হয়েছেন এবং তিনি ঐশী সাহায্য ও সমর্থনে পুষ্ট। তিনি যদি মিথ্যা দাবীকারী হতেন তাহ'লে হিন্দু ভ্রাতাগণের জন্য বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সকল ভ্রাতাদের জন্য কতকগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার ঘটনা একটার পর একটা সংঘটিত হতো না এবং আধ্যাত্মিক মোকাবেলায় ইসলামের স্বপক্ষে বিজয় লাভ করাও সম্ভব হতো না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.)-বলেছেন: "প্রকাশ থাকে যে, সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে শুধু মুসলমান জাতির জন্য প্রেরণ করেন নাই, বরং হিন্দু এবং খৃষ্টানদের সংস্কারের জন্যও প্রেরণ করেছেন।" "রাজা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার প্রতি যা প্রকাশ করা হয়েছে তাহলো যে তিনি তাঁর যুগের অবতার বা নবী ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি ছিল যে, শেষ-যুগে তাঁর অনুরূপ এক অবতার আবির্ভূত হবেন। ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতি আমার আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।" (লেকচার সিয়ালকোট, পৃ. ২০/৩৩)।

হিন্দুধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রদর্শিত ঐশী নিদর্শনাবলী সংক্রান্ত কয়েকটি ঘটনা নিম্নরূপঃ

(ক) আর্য সমাজী পন্ডিত লেখরামের ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ডের জন্য ঐশী শাস্তির ঘটনা

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 'আর্য সমাজী' নামে একটি নতুন হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায়ের লেখকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এইসব দুর্মুখ আর্য পন্ডিত এবং লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুঃসাহসী ছিল পন্ডিত লেখরাম। হযরত মীর্যা সাহেব অনেকবার লিখিতভাবে এই আর্য সমাজী নেতা লেখরামের কাছে ইসলামের সত্যতা এবং সৌন্দর্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু পন্ডিত লেখরামের কোন পরিবর্তন হলো না। পূর্ববৎ ইসলাম বিরোধী তৎপরতা এবং পরিকল্পনা চলতে থাকলো।

হযরত মীর্যা সাহেবের সঙ্গে লেখরামের মত-বিরোধ বাড়তে থাকলো এবং এক পর্যায়ে লেখরাম নিদর্শন দেখানোর জন্য হৈ চৈ শুরু করলো। **হযরত মীর্যা সাহেব আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা করলেন এবং দোওয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, লেখরামের দিন ঘনিয়ে আসছে।**

হযরত মীর্যা সাহেবের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী (অর্থাৎ 'লেখরামের দিন ঘনিয়ে আসছে') সাধারণভাবে বর্ষিত ছিল– অর্থাৎ এতে কোন নির্ধারিত সময়-সীমা ছিল না। পন্ডিত লেখরাম একটা সময়-সীমা দেওয়ার জন্য জিদ ধরলো। হযরত মীর্যা সাহেব আল্লাহতায়ালার কাছে দোওয়ার মাধ্যমে জানতে পারলেন যে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ সাল হতে অর্থাৎ এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রাপ্তির দিন থেকে পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে লেখরামের মারাত্মক পরিণতি সংঘটিত হবে" (হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ২৩৫)

* তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী একটি ইস্তেহার (বিজ্ঞপ্তি) হিসেবে নিম্নোক্ত ইলহামসহ প্রকাশ করলেন:

"ইজলুন জছাদুল লাহু খোয়ার। লাহু মাসাবুন ওয়া আযাব।"

অর্থঃ "একটি দুর্দশাগ্রস্থ দেহ সর্বস্ব গো-বৎস! তার জন্য দুঃখ ও শাস্তি রয়েছে।"

বস্তুতঃ হযরত সাহেব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন যে, লেখরাম যদি অসাধারণ কোন দুর্ঘটনা-জনিত শাস্তি না পায় তাহ'লে তিনি খোদাতা'লার প্রত্যাদিষ্ট বান্দা নহেন।

* তিনি আরবীতে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করলেন যার অর্থ হলো:

"আমার রব আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমি একটি ঈদের দিন দেখাবো এবং সেই দিনটি ঈদের সংলগ্ন হবে।"

* তিনি আরও লিখেছেন: **"খোদা তা'লা তাঁর অসীম করুণায় লেখরাম সম্পর্কে আমার দোয়াসমূহ কবুল করেছেন এবং আমাকে জানানো হয়েছে যে, সে চরম**

পরিণতি লাভ করবে ছয় বছরের মধ্যে।"

*** তিনি তার 'বরকাতুদ দোয়া' নামক পুস্তকে বিস্তারিতভাবে ঘোষণা করলেনঃ**

"আজ ২ এপ্রিল, ১৮৯৩ইং মোতাবেক ১৪ই রমযান ১৩১০হিঃ আমি নিজেকে একটি বৃহৎ কক্ষে কতিপয় বন্ধুসহ উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলাম। আমার সামনে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিসম্পন্ন এবং রক্তচক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখলাম..... সে বললো, লেখরাম কোথায়? তারপর সেই ব্যক্তি আর একজনের নাম বললো– আপাতঃদৃষ্টিতে লেখরামেরই কোন আত্মীয়ের ঠিকানা সম্বন্ধেও জানতে চাইল বলে মনে হলো।"

* হযরত মীর্যা সাহেব এই ঘটনা সম্বন্ধে 'আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম' নামক গ্রন্থে ফার্সী নযমের মাধ্যমে একস্থানে নিম্নোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করেনঃ

"হে নির্বোধ দিশেহারা দুশমন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সুতীক্ষ্ণ তরবারীকে ভয় কর।"

সংক্ষেপে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে অনেকগুলি বিষয়ের সংমিশ্রণ ছিল। লেখরাম কোন একটা মারাত্মক বিপদে পতিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাবাণীতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত ছিল। আর এজন্য নির্ধারিত ছিল ছয় বছর সময়সীমা। ঘটনার দিনটি হবে ঈদ সংলগ্ন এবং মৃত্যু ছিল অবধারিত, শরীর হবে ক্ষত বিক্ষত বিপর্যস্ত, সামিরী জাতির গো-বৎসের যেমন দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা হয়েছিল–সেরূপ অবস্থা হবে; সেই চরম পরিণতি ঘটবে এমন একজনের ছুরিকার মাধ্যমে যে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে উঠবে এবং শত্রু নিধনে যার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করবে।

পাঁচটি বছর কেটে গেল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না লেখরামের জীবনে। সময়-সীমা শেষ হয়ে গেল না কি? এরপরও কি হযরত মীর্যা সাহেবের দাবী সত্য বলে পরিগণিত হবে? অনেকে এধরণের নানা সন্দেহ সংশয়ের কথা বলতে লাগলো। রমযান মাস শেষ হতে চলেছে এবং পরবর্তী ঈদের দিনটি ছিল শুক্রবার। ঈদের পরদিন অর্থাৎ শনিবার একজন অজানা ব্যক্তি লেখরামের পেটে অত্যন্ত ধারালো ছোরা দ্বারা আঘাত করে পেটের পাকস্থলীতে ছোরাটি 'ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া' নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। পরে ডাক্তারগণও লেখরামের দেহ কর্তন করে। রোববার লেখরামের মর্মান্তিক মৃত্যু হলো। তার দেহ পোড়ানো হলো এবং দেহ ভরা নদীতে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। সামিরী জাতির গোবৎসের প্রতিও এরূপ ব্যবহার করা হয়েছিল। উভয়ক্ষেত্রে শনিবারেই দেহ ছিন্নভিন্ন করা হয়েছিল। যে গৃহে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল সেকানে লেখরাম, তার মাতা এবং স্ত্রী ছিল। নানা রকম প্রচেষ্টা সত্বেও প্রকৃত হত্যাকারীকে কেউ খোঁজ করতে পারে নি। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা সাহেবের প্রতি দোষারোপ করা হলে তিনি যে কোন সাক্ষ্য-প্রদানকারীকে খোদার নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ সেই আহ্বানে এগিয়ে আসতে সৎ সাহস পায়নি। পুলিশ তদন্তেও হযরত সাহেবের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় নি। হযরত সাহেবের দুটি পুস্তকে (ইসতেফতা এবং সিরাজ-ই-মুনীর) বিষয়টি সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ঐশী নিদর্শনের স্বপক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে মত প্রকাশ করেন। এইভাবে পূর্বোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে এবং হযরত মীর্যা সাহেবের দাবীর সত্যতাকে সন্দেহাতীতরূপে প্রতিভাত হয়েছে।

(খ) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীঃ

১৮৭৭ সনে পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যে, বৈদিক ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং বেদই একমাত্র ঐশী গ্রন্থ। হযরত মীর্যা সাহেব ইসলামের স্বপক্ষে তাঁকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ও যিন্দা ধর্ম, কুরআন শরীফই একমাত্র যিন্দা কিতাব এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) ই একমাত্র যিন্দা নবী। তিনি আর্য সমাজীদের ধ্যান-ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করে কয়েকখানি পুস্তক লিখলেন যে গুলির মধ্যে রয়েছে : 'সনাতন ধর্ম, নাসিমে দাওয়াত' 'শাহনায়ে হক' 'চশমায়ে মারেফাত', 'সুরমাহ চশমায়ে আরিয়া, 'কাদিয়ানকে আরিয়া আওর হাম, ইত্যাদি। হযরত মির্যা সাহেব আর্য সমাজীদের মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। কিন্তু দয়ানন্দ মহাশয় সহ অন্যান্য আর্য সমাজী পন্ডিতদের মধ্যে কেউই তাঁর চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারে নাই। হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহ তা'লার তরফ হতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারেন এবং তা সবাইকে জানালেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ১৮৮৩ সনে দয়ানন্দ সরস্বতী মৃত্যু বরণ করেন।

(গ) পন্ডিত ইন্দ্রমন মুরাদাবাদীর সঙ্গে মোকাবেলা এবং তার পলায়ণঃ

হযরত মির্যা সাহেব ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে রচিত তাঁর পুস্তকাবলী আর্য সমাজী বিশিষ্ট নেতাদের নামে ডাকযোগে প্রেরণ করেন। এই সব নেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইন্দ্রমন মুরাদাবাদী। **১৮৮৫ সনে হযরত সাহেব ঘোষণা করেন যে, আর্য সমাজীদের নেতৃস্থানীয় যে কোন এক ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা পরীক্ষার জন্য স্বয়ং কাদিয়ানে এসে এক বৎসর বসবাস করে স্বচক্ষে ইসলামী নিদর্শন এবং মোযেজা অবলোকন করতে পারেন এবং এজন্য ২৪০০ টাকার চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়।**

এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে আর্য সমাজীদের মধ্যে মাত্র পণ্ডিত ইন্দ্রমন মুরদাবাদী উপরোক্ত শর্তাবলী পালনে সম্মত হন। হযরত মির্যা সাহেব তাঁর প্রিয় শিষ্য হযরত আবদুল্লাহ সানাওয়ারী সাহেবকে তাঁর পয়গাম সহ পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেন এবং প্রস্তাব দিলেন যে, পরের দিন সকালেই তারা দুই হাজার চারশত টাকা পণ্ডিত মহাশয়কে প্রদান করবেন। এই প্রস্তাবে পণ্ডিত মহাশয় সম্পূর্ণভাবে রাজী হলেন। পরদিন যথাসময়ে বাসাতে গেলেন। কিন্তু দেখা গেল যে তিনি বাসাতে নেই এবং জানা গেল যে, তিনি গত রাতেই ট্রেন–যোগে লাহোর ত্যাগ করেছেন এবং কোথায় গেছেন তা বলে যাননি। এই ঘটনার পর পন্ডিত মহাশয় আর কখনো কোন কর্ম তৎপরতা দেখান নাই এবং কিছু কালের মধ্যে তিনি ইহলীলা ত্যাগ করেন।

(ঘ) 'শুভ চিন্তক' পত্রিকার পরিচালক সোমরাজ, পণ্ডিত ইচ্ছর চন্দ্র এবং ভগবত রামের প্লেগজনিত মৃত্যুঃ

পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যুর পর স্থানীয় আর্য সমাজীরা হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে অপপ্রচার শুরু করেন। এরূপ প্রচারাভিযানের সুবিধার্থে তারা কাদিয়ান হতে 'শুভ চিন্তক' নামে একটি পত্রিকা

প্রকাশ করতে লাগলেন। **হযরত মির্যা সাহেবকে আল্লাহ্ তা'লা জানালেন যে, যারা ইসলামের উপর সম্মিলিত আক্রমণ চালাবে তারা অচিরেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে বাধ্য হবে (তাযকেরা, পৃঃ ২৯)। ১৯০৫ সনে প্রণীত 'তাযকিরাতুশ শাহাদাতাঈন পুস্তকে (পৃঃ ৬১)** তিনি আর্য সমাজীদের সম্পর্কে এই মর্মে ঘোষণা করলেন যে, দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজী নামক ধর্মীয় সংস্থার মিথ্যা প্রচারণাকে ভয় করার কোন কারণ নাই। কেননা আর্য সমাজীদের ধ্বংস অনিবার্য কারণ এই মতবাদটি আকাশ হতে নাযিলকৃত নয় এবং আর্য সমাজীরা যমিনের কথাই পেশ করে, কিন্তু আকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন কথা কখনও তারা বলে না। উল্লেখ্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজী সংস্থার মজ্জাগত উদ্দেশ্য ছিল ছলে-বলে এবং কৌশলে মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং নিরীহ মুসলমানদেরকে শুদ্ধি আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করা। উল্লেখিত তিনজন পণ্ডিত ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া এবং ইসলামের ঘোর বিরোধী দুর্মুখ লেখক ও বক্তা।

এই সময় ঘটনাক্রমে পণ্ডিত ইচ্ছর চন্দ্র মহাশয়ের সঙ্গে একদিন কাদিয়ানের পোষ্ট অফিসে আহমদীয়া জামাতের 'আল হাকাম' নামক পত্রিকার সম্পাদক এবং হযরত মির্যা সাহেবের একজন প্রিয় শিষ্য জনাব শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবের সাক্ষাৎ হয়ে যায়। কথা প্রসঙ্গে জনাব ইরফানী সাহেব প্লেগের নিদর্শন সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং **মির্যা সাহেবের দাবীর সত্যতার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে প্লেগ হতে হযরত মির্যা সাহেবের গৃহের প্রাচীরের মধ্যে বসবাসকারীদের নিরাপত্তামূলক ঘোষণার উল্লেখ করেন। পণ্ডিত মহাশয় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "ইয়ে ভি কোই নিশান হ্যায়? ম্যাঁয় ভি কহতা হোঁ কে ম্যাঁয় ভি তাউন ছে নেহি মরোঙ্গাঁ।"** জনাব ইরফানী সাহেব তৎক্ষণাৎ গায়রতের সঙ্গে বললেনঃ তুমি অবশ্যই প্লেগে মারা যাবে। কিছুকাল পরে কাদিয়ানে ব্যাপকভাবে প্লেগ দেখা দেয় এবং 'শুভচিন্তক' পত্রিকার পণ্ডিত সোমরাজ, অন্যতম সংগঠক পণ্ডিত ঈচ্ছর চন্দ্র এবং তার সহযোগী পণ্ডিত ভগবৎরাম প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এমন কি তাদের পরিবারবর্গও প্লেগে নিশ্চহ্ন হয়ে গিয়েছে এবং 'শুভচিন্তক'-এরও চির সমাপ্তি ঘটেছে।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেছেনঃ "আমি সকল জাতির সংস্কারের জন্য প্রেরিত হয়েছি..."

* "পবিত্র কুরআনে (সূরা ফাতির ২৫, নমলঃ ৩৭, মুমিনঃ ৮, সুরা ইউনুসঃ ৪৮) বলা হয়েছে এমন কোন জাতি নেই যাদের নিকট সতর্ককারী আসেনি। আরো বলা হয়েছে পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের সকল শিক্ষা কুরআনে মওজুদ আছে।' ... এমন এক সময় আসবে যখন আল্লাহ্ তা'লা সকল মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করবেন...। (Review of Religions, vol-2, 1903)।

* "সন্দেহাতীতভাবে আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি যে হিন্দুরা মানুষ বা বান্দাকে ঈশ্বর বানানোতে খৃষ্টানদের পথিকৃৎ ছিল। খৃষ্টানরা তাদেরই আবিষ্কারের অনুসরণ করেছে। আমরা কোন ভাবেই এই বিষয়টিকে গোপন রাখতে পারছি না, যুক্তি-ভিত্তিক আপত্তি থেকে বাঁচার জন্য খৃষ্টানরা যে সব বিষয় বানিয়েছে তা তাদের নিজেদের মস্তিস্ক-প্রসূত নয়, বরং হিন্দু শাস্ত্র ও গ্রন্থ থেকে চুরি করে নেয়া হয়েছে। এসব গুরুতর মিথ্যা অপব্যাখা ব্রাহ্মণরা পূর্ব থেকেই শ্রীকৃষ্ণ ও রামচন্দ্রের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছিল যেগুলো খৃষ্টানদের কাজে লেগেছে।" (নূরুল কুরআন, ১ম খণ্ড)।

* "চশমায়ে মারেফাত' এবং "সুরমা চশমায়ে আরিয়া" এবং আরো কয়েকটি পুস্তকে হিন্দুদের অবতারবাদ এবং জন্মান্তরবাদ খণ্ডন করেছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেছেন: "প্রকাশ থাকে যে, সর্বশক্তিমান খোদা আমাকে শুধু মুসলমান জাতির জন্য প্রেরণ করেন নাই, বরং হিন্দু এবং খৃষ্টানদের সংস্কারের জন্যও প্রেরণ করেছেন।" "রাজা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার প্রতি যা প্রকাশ করা হয়েছে তাহলো যে তিনি তাঁর যুগের অবতার বা নবী ছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি ছিল যে, শেষ-যুগে তাঁর অনুরূপ এক অবতার আবির্ভূত হবেন। ঈশ্বরের সেই প্রতিশ্রুতি আমার আবির্ভাবের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।" (লেকচার সিয়ালকোট, পৃ: ২০/৩৩)।

* "আমার প্রতি এই ইলহামও হয়েছিল যে, হে কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল! তোমার মহিমা গীতায় লিখিত আছে। হিন্দুদের কেতাবগুলিতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং তা হচ্ছে এই যে, শেষ যুগে একজন অবতার আসবেন যিনি কৃষ্ণের সদৃশ হবেন। আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে সে আমিই।" (তোহফায়ে গোলড়বীয়া)

* এমন কোন জাতি নাই যাদের মাঝে আমার দিনর্শন প্রকাশিত হয় নাই। এমন কোন সম্প্রদায় নাই যারা আমার নদর্শনাবলীর সাক্ষী নহে (হাকীকাতুল ওহী পৃ. ২৫১)

(চলবে)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার সম্মানীত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী রয়ে গিয়েছে। ইতমধ্যে নতুন অর্থ বছর শুরু হয়েছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন।

ওয়াসসালাম
খাকসার
সেক্রেটারী ইশায়াত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

জুমু'আর দিনের গুরত্ব

ফুরাদ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা

প্রত্যেক ধর্মে সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিবস রয়েছে, যেমন ইহুদীরা শনিবারে সাবাত পালন করে, খ্রিষ্টানরা রবিবারে এবং মুসলমানরা শুক্রবারে সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিবস পালন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

অর্থাৎ হে মুমেনগণ! জুমু'আর দিনের একটি অংশে যখন নামাযের জন্য তোমাদের ডাকা হয় তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে দ্রুত এগিয়ে আস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দাও। তোমাদের জন্য এটাই উত্তম (তা) যদি তোমরা জানতে। (সূরা আল জুমু'আ : ১০)

ইহুদীরা আল্লাহ্ ও নবী করীম (সা.)-এর বাণীকে অগ্রাহ্য করেছে এবং নিজেদের সাবাত দিবসকে অপবিত্র করে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধভাজন হয়েছে। কারণ তারা সাবাতের দিনে ইবাদত বাদ দিয়ে মাছ শিকারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। যেভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অর্থ: আর তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে) সাগরতীরে অবস্থিত সেই জনপদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর যেখানে তারা (অর্থাৎ ইহুদীরা) সাবাতের বিধান লংঘন করতো। তাদের (জন্য নির্ধারিত) সাবাতের দিনে তাদের মাছ তাদের কাছে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতো। আর যেদিন তারা সাবাত পালন করতো না, তাদের কাছে সেগুলো আসতো না। এভাবেই তাদের ক্রমাগত দুষ্কর্মের দ্বারা আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করতাম (সূরা আল আ'রাফ : ১৬৪), আর সূরা জুমু'আর ১০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে তাকিদ ও নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তারা সাপ্তাহিত জুমু'আর নামায আদায় করতে কখনো অবহেলা না করে।

জুমু'আর নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, "আমার উম্মত যেন জুমু'আর নামাযের অবহেলা সম্পর্কে সতর্ক থাকে, অন্যথায় আল্লাহ্ তাদের আত্মার ওপর মোহর মেরে দিবেন এবং তারা অবহেলিতদের মধ্যে গণ্য হবে।" (মুসলিম)

তিনি (সা.) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি লাগাতার তিনটি জুমু'আ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।"

জুমু'আর দিনের আদব হলো, ভাল করে গোসল করে, ব্রাশ করে, পরিষ্কার জামা কাপড় পরিধান করে, ভাল করে ওযু করে এবং খুতবা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে মসজিদে আসা ও মসজিদের প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করা। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.) বলেন,

"যে ব্যক্তি শুক্রবারে ভালভাবে ওযু করে জুমু'আর নামাযে আসে এবং নিরবতার সাথে খুতবা শ্রবণ করে, পূর্ববর্তী শুক্রবার হতে তার সকল পাপ ক্ষমা করা হয়।" (মুসলিম)

রসূলে করীম (সা.) আরো বলেন, "ঐ দিন (জুমু'আর দিন) এমন একটি মুহূর্ত আসে এবং কেউ যদি নামাযরত অবস্থায় এই মুহূর্ত পায়, তবে সে যে দোয়াই করবে তা কবুল করা হবে কিন্তু সময়টা খুব অল্প।" (মুসলিম)

রসূলে করীম (সা.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি একটি জুমু'আ ছেড়ে দেয়, তার অন্তরের এক চতুর্থাংশ কালো হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি দু'টি জুমু'আ ছেড়ে দেয় তার অন্তরের চার ভাগের তিন ভাগ কালো হয়ে যায় আর যে ব্যক্তি টানা চারটি জুমুআ ছেড়ে দেয়, তার পুরো অন্তর কালো হয়ে যায়।

মুসলমানদের জন্য তিনটি ঈদের দিন রয়েছে, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও পবিত্র জুমু'আর দিন। এই দিন সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কিন্তু বহু লোক এই ঈদ সম্পর্কে উদাসীন। অন্যান্য ঈদে কাপড় পরিবর্তন করে কিন্তু এই ঈদের কোন পরওয়া করে না এবং ময়লা কাপড় পরিধান করে আসে। আমার নিকট এই ঈদ অন্যান্য ঈদের চাইতে উত্তম।

হাদীসে এসেছে যে, শনিবারে মাটি, রবিবারে পাহাড়, সোমবারে গাছপালা, মঙ্গলবারে বিপদ আপদ, বুধবারে আলো ও বরকত, বৃহস্পতিবারে জীবজন্তু এবং জুমু'আর দিনে আসরের সময় হযরত আদম (আ.) জন্মগ্রহণ করেন ও ঐ দিন তাঁর তওবা কবুল করা হয়, আর কুরআন মজীদ নাযিল হওয়া শেষ হয় পবিত্র এই জুমু'আর দিনে।

খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল বলেন, হিন্দুস্থানে মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ হলো জুমু'আর নামায পরিত্যাগ করা। সুতরাং যারা নিয়মিত জুমুআর নামায পড়ে, চাঁদা প্রদান করে, তারা খাঁটি আহমদী।

হযরত উমর (রা.)-কে এক ইহুদী বললো, কুরআনে এমন একটি আয়াত রয়েছে, যদি এটি আমাদের কিতাবে নাযিল হতো, তাহলে আমরা সেদিন ঈদ উদযাপন করতাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, কোন্ সে আয়াত? তখন সে ইহুদী বললো,

"আল ইওমা আকমালতু লাকুম দিনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নে'মাতি ওয়া রাজিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা" অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। (সূরা আল মায়েদা : ৪)

তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, সে দিন তো আমাদের নিকট দুই ঈদের দিন

ছিলো, জুমু'আর দিন ও আরাফাতের দিন এই আয়াত নাযিল হয়।

ইহুদীরা স্বীকার করে যে তাদের অধঃপতন সাবাতের অসম্মান করার কারণে হয়েছে। এখন তাদের উন্নতি ইসলামের সাথে জড়িত। তারা যদি সাবাতের মর্যাদাকে কায়েম করতে চায়, তাহলে তাদেরকে মুসলমান হয়ে জুমু'আর নামাযের প্রতি যত্নবান হতে হবে। কেননা, ধ্বংস আসে আল্লাহ্‌র আদেশ না মানার কারণে।

সঠিকভাবে সালাত কায়েম খেলাফত ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, নামাযের একটি বিশেষ অংশ জুমু'আর নামায এবং তাতে জাতীয় বিষয়াবলী সামনে রাখা হয় আর এটা একমাত্র খলীফার পক্ষে জানা সম্ভব যে, কোথায় কি হচ্ছে। আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) জাতীয় প্রয়োজন সামনে রেখে খুতবা প্রদান করতেন।

তিনি (রা.) বলেন, এ সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন। আমি কোথাও পড়েছি, এক ইমাম সাহেব জুমুআর নামাযে ফার্সীতে খুতবা দিলেন, এবং এরপর বললেন, চলুন আমরা হাত উঠিয়ে দোয়া করি, আল্লাহ্‌ যেন জাহাঙ্গীর বাদশাহকে নিরাপদে রাখেন, অথচ তিনি অনেক আগেই মারা গেছেন এবং তখন ইংরেজ শাসন চলছিলো।

হানাফীদের ফতওয়া হলো যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে কোন সুলতান বা বাদশাহ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জুমু'আর নামায পড়া ঠিক নয়। ধারণাটি একেবারে সঠিক।

হিন্দুস্থানে যখন ইংরেজ শাসন চলছিলো তখন ওহাবিরা বললো হিন্দুস্থানে জুমু'আর নামায হতে পারে কিন্তু হানাফীরা বললো হিন্দুস্থানে জুমু'আর নামায হতে পারে না, কারণ বর্তমানে কোন মুসলমান বাদশাহ নেই।

তাই ওহাবিরা প্রথমে জুমু'আর নামায পড়তো পরে আবার এহতিয়াতি বা সতর্কমূলক যোহর নামায পড়তো। তারা ভাবলো, যদি জুমুআ ওয়ালা মসলা সঠিক হয় তবে আল্লাহ্‌র সামানে জুমু'আর নামায দাঁড় করিয়ে দিবো আর যদি যোহরের ফতওয়া সঠিক হয়, তাহলে যোহরের নামায দাঁড় করিয়ে দিবো।

সুতরাং আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে যুগ ইমাম মানার এবং সত্য জামাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছে। তাই আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে যুগ ইমামের কথা মতো চলার এবং জুমুআর নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করে তা আদায় করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আল্লাহ্‌ পাক ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামী করা অমর্যাদার কাজ

খালিদ আহমেদ সিরাজী, চট্টগ্রাম

আল্লাহ পাকের বান্দা বা দাস হওয়া সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় এই বিশ্বাসে কারো দ্বিমত নাই। আল্লাহ নৈকট্য লাভকারী নবী, রাসুলগন, এবং খলীফাগন কখনো আল্লাহ্‌ পাকের বান্দাহ হতে লজ্জাবোধ হতে কুণ্ঠবোধ করেন না। কারন খোদাতালার দাসত্ব ও গোলামী করা, তাঁর ইবাদত বন্দেগী করা, আদেশ নিষেধ পালন করা, সৌভাগ্যের ও মর্যাদা বিষয়। এক কথায় আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামী করা অমর্যাদার কাজ অর্থাৎ বিদআত।

বর্তমান বিশ্বে লক্ষ্য করা যায় খৃষ্টানরা হযরত ইসা (আঃ) কে ঈশ্বর পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে মুশরিকরা ফিরিস্তাদের ঈশ্বর দুহিতা ও দেবী মুর্তি নির্মান করে পুজা অর্চনা ইতিমধ্যে শুরু করেছে। আবার মুসলমানদের অনেকে পীর প্রথা প্রচলন কর মাজারে, মাজারে দু'আ ও মানত করে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পাক এই ধরনের কাল্পনিক বিশ্বাসীদের হিসাব নিবেন। পবিত্র কুরআনে চুড়ান্তভাবে ঘোষনা দিয়েছে এই বলে, 'ফাদখুলী ফী ইবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতি'- তোমরা আমার (আল্লাহর দাসত্বের আওতায় প্রবেশ কর এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। এতে পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে প্রদত্ত সর্বশেষ পুরষ্কার হচ্ছে জান্নাত লাভ করা।

এই কাংখিত জান্নাত লাভের অন্যতম যোগ্যতাধারী হলেন আল্লাহ্‌ পাকের খাস বান্দাগন ও আল্লাহ্‌ পাকের অনুগত দাসগন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ পাকের অনুগত হতে হলে আল্লাহ্‌ পাকের আদেশ, নিষেধ ইহজগতে পালন করতে হবে। তারাই চুড়ান্তভাবে সফলতা লাভে সক্ষম হবেন। তাদের পরকালে ভয় নাই। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌ পাকের দাসত্বকে গ্রহন করতে চায়না যুগের ইমামকে মানতেও চাননা, বরং অবাধ্যতা প্রকাশ করবে অহংকারে নিমজ্জিত হবে, আল্লাহ্‌ পাক তাদের সকলকে বিচার দিবসে জিজ্ঞাসিত ও বিচার করবেন এবং বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। তখন কোনক্রমেই আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পীর, ফকির অভিভাবক খুঁজে পাওয়া যাবেনা। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌ পাকের দাসত্বকে মেনে নিয়ে ঈমান আনয়ন করবে, সৎ কাজে আত্বনিয়োগ করবে, এবং যুগের ঈমামকে মানবে, তারাই পরিপূর্ন সওয়াব ও আল্লাহ্‌ পাকের ভালবাসা লাভ করবেন বরং স্বীয় অনুগ্রহ পাবেন। হয়তবা আল্লাহ্‌ পাকের দীদার বা দর্শন লাভ করবেন। মনে রাখতে হবে, দাসত্বের চুড়ান্ত অভিব্যক্তি তখনই মানুষের মাঝে দেখা যায় যখন বান্দাহ্‌ সেজদায় নিপত্তিত হয়, এই সেজদাহরত অবস্থায় বিকলিত চিত্তে আল্লাহ্‌ পাককে স্মরণের মাধ্যমে নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। এই অধিকতর নৈকট্য লভ বান্দাহর জন্য আল্লাহ্‌ পাকের দীদার লাভের পথকে সুগম করে চুড়ান্ত মঞ্জিলে উপনীত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে।

তাই আল্লাহ্‌ পাকের দাসত্বকে স্বীকার করে সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য একে অপরের মাঝে প্রতিযোগিতা করা উচিত।

আহ্! ধর্মে অন্তঃপ্রাণ খেলাফতে আহমদীয়ার একনিষ্ঠ এক সেবক মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব আমাদের মাঝে আর নেই

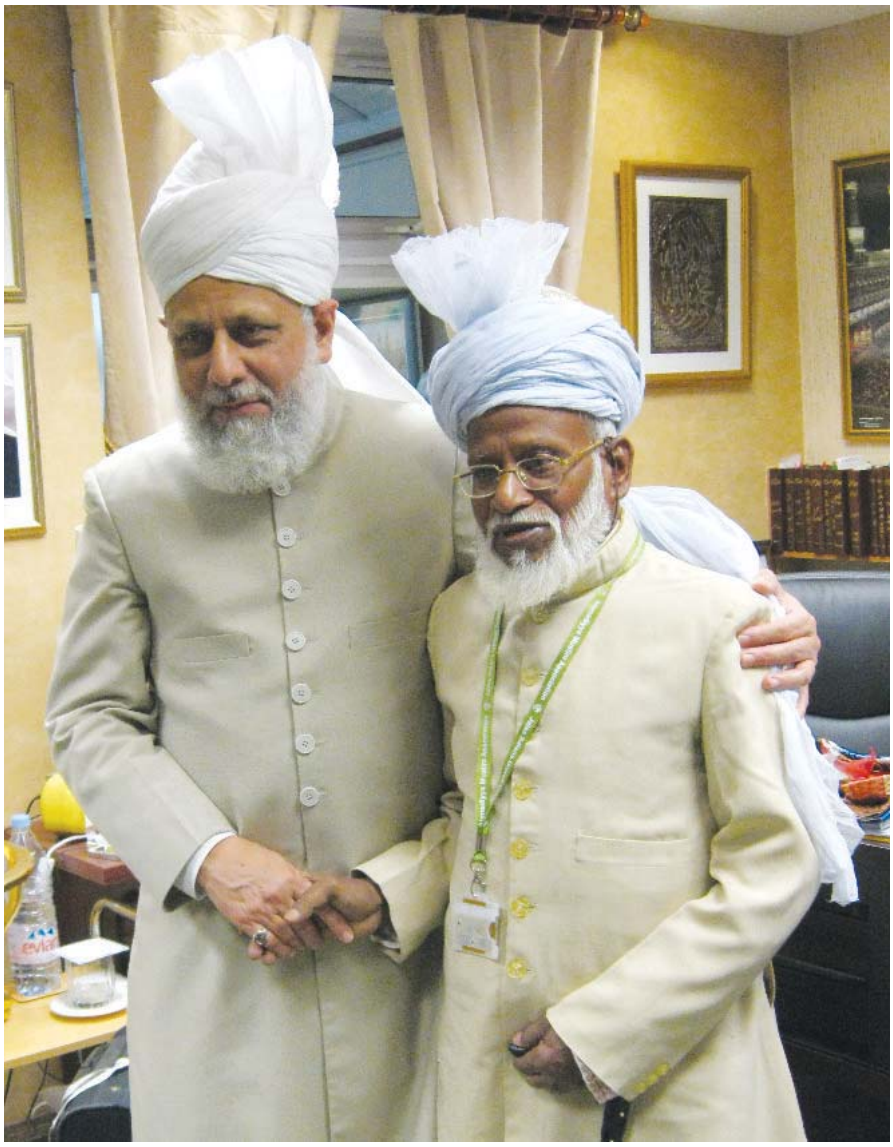

প্রাণপ্রিয় খলীফা হুযূর (আই.)-এর পবিত্র সান্নিধ্যে একনিষ্ঠ সেবক

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিয়োগাত্মক এ সংবাদ জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের প্রবীণ বুযুর্গ মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলা আলিয়া আহমদীয়া গত ২৬ জুলাই ২০১৮ বৃহস্পতিবার বিকাল আনুমানিক ৬:২৫মি.-এ ঢাকা মহানগরীর বকশিবাজার লেনস্থ বাসভবনে নিজ স্বীয় প্রিয় প্রভুর সন্নিধানে যাত্রা করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন। মরহুমের প্রথম নামাযে জানাযা পরের দিন ২৭ জুলাই শুক্রবার বা'দ জুমু'আ বকশিবাজার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ জুলাই শনিবার বিকাল ৬টার দিকে আহমদনগরে দ্বিতীয় জানাযা শেষে আহমদনগর মসজিদের নিকট তাঁর নিজস্ব জমিতে তাঁর দাফনকার্য সুসম্পন্ন হয়। মরহুম মৃত্যুকালে স্ত্রী, দুই পুত্র, তিন কন্যা, এগারো নাতি-নাতনী সহ পরিবারের সদস্যগণ ও বিশ্ব জুড়ে শোক সন্তপ্ত অগণিত গুণগ্রাহী রেখে যান।

মরহুম আব্দুল আযীয সাহেবের জন্ম আনুমানিক ১৯৩৬ সালে নরসিংদী জেলার মনোহরদি উপজেলার জীবকায়া গ্রামে। পিতার নাম সাহেব আলী, মাতার নাম মালিহা। তাঁর বয়স যখন ৪-৫ বছর তখন তাঁর মা ইন্তেকাল করেন।

মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর শৈশবের বেশি অংশ কাটে নিকটবর্তী নানা বাড়ি রামপুরে। তাঁর চার মামার মধ্যে ছিলেন জামা'তের বিশিষ্ট সেবক নূরুদ্দীন আফ্রাদ মরহুম। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সংবাদ পেয়ে আট-নয় বছর বয়সে বাবা ও মামাদের সাথে তিনি বয়'আত গ্রহণ করেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি বাবা ও মামাদের উৎসাহ এবং নিজ আগ্রহে কাদিয়ান গমন করেন। বাবা সেখানে তাঁকে ওয়াক্‌ফ করে দেন। সেখানে তিনি হযরত ড. মুফতি মুহাম্মদ সাদিক (রা), হযরত মৌলানা শের আলী (রা) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবী ও বুযুর্গানের তরবিয়তে বাল্যকাল ও কৈশোর অতিবাহিত করেন।

দেশভাগের সময় বাইরের ছাত্রদের বাড়ি পাঠানো হয়। কিন্তু, পরের বছর তিনি দাঙ্গা-বিক্ষুব্ধ ভারতের শঙ্কাপূর্ণ পথে একাকী কলকাতা-দিল্লী-লাহোর হয়ে রাবওয়া পৌঁছেন এবং জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তির সুযোগ পান। সেখানে তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী (প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া), মৌলানা যহুর হোসেন (মুবাল্লেগ, বুখারা), মৌলানা আবুল হাসান কুদসী (সৈয়দুশ্ শুহাদা সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রা) এর পুত্র), মৌলানা জাফর আহমদ জাফর (তিনি ভাল কবিও ছিলেন), মৌলানা চৌধূরী গোলাম হায়দার, মৌলানা কুরাইশী মুহাম্মদ নযীর সুলতানী, মৌলানা মুহাম্মদ শফী আশরাফ প্রমুখগণ।

তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন মৌ. উসমান চীনী, মৌ. আব্দুল ওয়াহাব আদম (আমীর, ঘানা), মৌ. মাহমুদ আহমদ শুবূতী (মুবাল্লেগ, আদন-ইয়েমেন), মৌ আব্দুল আযীয ওয়ায়েস (মুবাল্লেগ, ফিজি)। দু'জনের নাম আব্দুল আযীয হওয়াতে পার্থক্য করার জন্য শিক্ষক মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব তাঁর নামের সঙ্গে 'সাদেক' শব্দটি যুক্ত করে দেন।

জামেয়ায় শিক্ষার্থী থাকা কালে আল্লাহর ফযলে তাঁর ফলাফল ভাল ছিল। জামেয়ায় ছয় বছর পাঠ শেষ করার পর জামেয়াতুল মুবাশ্‌শেরীনে আরো তিন বছর পড়াশুনা করে উচ্চতর শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। এখন শাহেদ ডিগ্রী প্রদানের পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়াও এর মধ্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ও পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স-ইন-এ্যারাবিক বা মৌলভী ফাযেল ডিগ্রীও তিনি লাভ করেন।

বিভিন্ন বিভাগে দাপ্তরিক প্রশিক্ষণের পর একজন সিনিয়র মুরব্বী মৌলানা সৈয়দ আহমদ আলী শাহ-এর তত্ত্বাবধানে তাঁকে লায়লপুর (বর্তমান ফয়সালাবাদ)-এ পাঠানো হয়। এরপর স্ব দায়ীতপ্রাপ্ত মুরব্বী হিসেবে তাঁর প্রথম পোস্টিং হয় ফয়সালাবাদের অদূরে 'শমূদ্রী' নামক স্থানে।

১৯৬৩/১৯৬৪ তে তাঁর পোস্টিং হয় বাংলাদেশে (অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে)। তখন উত্তর বঙ্গের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর এলাকায় ও পরবর্তীতে কিছুদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সালে উথলী জামা'তের বিশিষ্ট বুযুর্গ আমীর হোসেন সাহেবের বড় কন্যা হোসনে আরা বেগমের সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) পবিত্র কুর'আনের বাংলা অনুবাদের কাজের জন্য বোর্ড গঠন করলে এর সদস্য ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, মৌলানা চৌধুরী মুজাফ্‌ফর উদ্দিন, এডিটর রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স, এবং মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক। ১৯৬৯ সালের রাবওয়া জলসার পর থেকে কুর'আনের বাংলা অনুবাদের জন্য তাঁকে রাবওয়ায় রেখে দেয়া হয়। সেই সাথে চিঠিপত্র অনুবাদের কাজও তিনি করেন। মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বেশ কিছু দিন কাজের পর দেশে ফিরে এলে এবং ৮-১০ মাস পর মৌলানা চৌধুরী মুজাফ্‌ফর উদ্দিন সাহেবও ইন্তেকাল করলে অনুবাদের কাজ তিনিই করতে থাকেন। ১৯৭৯ সালে তিনি আবার দেশে চলে আসেন। মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবও ইন্তেকাল করলে অনুবাদের সিংহভাগ কাজ তিনিই সম্পন্ন করেন।

এরপরে তিনি দেশে বিভিন্ন এলাকায় তবলীগ ও তালীম-তরবিয়তের কাজের সুযোগ পেয়েছেন। ধর্মের জন্য রক্ত দেয়ার মহা সুযোগও তিনি পেয়েছেন। ১৯৯২ সালের ২৯শে অক্টোবর বকশীবাজারে আমাদের মসজিদ আক্রান্ত হলে তিনি লাঠি হাতে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। তাঁর হাঁড় ভেঙ্গে দেয়া হয়, মাথা ফাটিয়ে দেয়া হয়। এ ছাড়াও ১৯৯৪ সালে বাহেরচরে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা গুরুতর আহত হন। মাহিল্যায় তিনি কারাবরণ করেন এবং 'রাহে মওলা'-র নির্ভিক এক সেবক হিসেবে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও দৃঢ়চিত্ততার সাথে হাসি মুখে এ সময় অতিবাহিত করেন। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় তবলীগ ও তরবিয়তের অনেক সুযোগ আল্লাহ তা'লা তাঁকে দান করেন। আহমদনগর থেকে কয়েক মাইল দূরে কমলাপুকুরী জামা'ত প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন এলাকায় সূচনালগ্নে তাঁর কাজের সুযোগ হয়েছে।

জামা'তের কেন্দ্রীয় এ্যাডিশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত নওমুবাঈন হিসেবে ও মজলিসে আনসারুল্লাহর ন্যাশনাল আমেলায় বিভিন্ন পদে তিনি সেবা করেন।

ইবাদতে অত্যন্ত একনিষ্ঠ ছিলেন। তাহাজ্জুদ ও তারাবীহতে তাঁর সুমধুর, হৃদয়-নিঙড়ানো তিলাওয়াত রাবওয়া ও বাংলাদেশ জুড়ে মানুষ এখনো স্মরণ করে থাকে। তাঁর দরসও ছিল সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। শেষ অসুস্থতার মাঝেও তাঁর কষ্ট করে মসজিদে আসা এবং যতদিন সম্ভব কষ্ট করে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সাক্ষী অনেকেই আছেন।

যেকোনভাবে জামা'তের সেবায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। অসময়ে তবলীগী মেহমান আসলে, কারো মরদেহ গোসলের প্রয়োজন পড়লে, তাহাজ্জুদের দায়িত্ব পড়লে সাগ্রহে, সোৎসাহে কাজ করতেন। চিঠি-পত্রের দ্রুত উত্তর দিতেন, উর্ধ্বতনের ডাকে দ্রুত বিনা বাক্য-ব্যয়ে সাড়া দিতেন।

সারা জীবন সাদা-সিধা সরল জীবন-যাপন করেছেন। রসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নতের অনুসরণে তিনি সব সময় সাদা পোশাকই পরেছেন। বিশেষ অনুষ্ঠানে আচকান ও পাগড়ী পরতেন। কিন্তু, স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতন ছিলেন। নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। শীর্ষাসনসহ কঠিন ব্যায়ামও তিনি করতেন। ১৯৯২ এর আক্রমণ মোকাবেলায় তাঁর শক্তি প্রকাশ পায়। আহমদনগর থেকে কমলাপুকুরী যাওয়ার সময় তাঁর সাথী খোদ্দামরা তাঁর সাথে হাঁটায় পেরে উঠতো না; খোদ্দামদের এমনিতে যেখানে এক ঘণ্টা লাগতো, তিনি তা যেতেন ৪০ মিনিটে।

শেষ অসুস্থতা দীর্ঘ ও কঠিন হলেও সর্বদা তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, "আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি!" শেষ সময়েও তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনার কী করতে মন চায়?" তাঁর উত্তর ছিল, "জামা'তের কাজ করতে"।

সব মিলিয়ে দোয়ার এক অসাধারণ উৎস, আল্লাহ তা'লা, কুর'আন ও রসূল (সা) এর প্রকৃত প্রেমিক, অগণিত নিদর্শনের অধিকারী, সাধারণভাবে সকলের প্রতি সুধারণা পোষণকারী এ মানুষটি ছিলেন আমাদের অনেকেরই প্রেরণার এক অসাধারণ উৎস। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের উত্তরাধিকারীসহ আমাদের সকলের মাঝে তাঁর পুণ্যময় দৃষ্টান্তগুলো সদা জাগরুক রাখুন।

[আহমদী রিপোর্ট]

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

মিরপুরে সিরাতুন্নবী (সা.) দিবস ও প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত

গত ২১ জুলাই, ২০১৮ রোজ শনিবার বাদ আসর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর-এর উদ্যোগে "সিরাতুন্নবী (সা.) দিবস ও প্রশ্নোত্তর সভা" মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর এর আমীর মোহতরম মোহাম্মদ গোলাম কাদের। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব। "মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ"– বিষয়ে বক্তৃতা করেন সোলায়মান সুমন, মুরুব্বী সিলসিলাহ। মাগরীব ও এশার নামাযের বিরতির পর সভার কাজ পুনরায় শুরু হয়ে রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত চলে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করেন হাজারী আহমদ আল-মুনিম, মুরুব্বী সিলসিলাহ। আগত জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ আব্দুল আউয়াল খাঁন চৌধুরী সাহেব ও স্থানীয় মুরুব্বী ফুরাদ আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলাহ।

অনুষ্ঠানে ১১৩ জন অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন এবং ৭ জন বয়াত গ্রহণ করেন। আলহামদুলিল্লাহ। সভায় আনসার, খোদ্দাম, লাজনা ও মেহমানসহ ২৯০ জন অংশগ্রহণ করেন যাদের মধ্যে মিরপুরে অবস্থানরত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বয়াতগ্রহণকারী নও-মোবাইন সদস্য-সদস্যাগণও অন্তর্ভুক্ত।

সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য রাতের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল।

আবু জাকির আহমদ, যয়ীম আলা
মজলিস আনসারুল্লাহ, মিরপুর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ জুলাই ২০১৮ শনিবার বিকাল ৫.৩০ মি. ঢাকা জামাতের উদ্যোগে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে একটি তবলীগ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সালেহ আহমদ (নও মোবাঈন), এরপর দোয়া পরিচালনা করেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। স্বাগত বক্তব্যে কুরআন হাদীস থেকে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমনকাল, তাঁর আবির্ভাব ও সত্যতার প্রমাণ পেশ করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, সেক্রেটারী তবলিগ ও নায়েব আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

অতঃপর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পরিচিতি লিফলেট পড়ে শুনান মোহাম্মদ নূরুল আমীন। তাঁর বক্তব্যের মাঝে মাগরিবের বিরতী হয়। নামাযের পর তাঁর অবশিষ্ট বক্তব্যের পর প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ৯৫ জন। অ-আহমদী মেহমান ছিল ৩৭ জন। উক্ত অনুষ্ঠানে ২ জন বয়আত গ্রহণ করেন। সর্বশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সেক্রেটারী তবলীগ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

ফতুল্লা জামাতে ওসীয়্যত সম্মেলন ২০১৮ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লায় গত ২৯/০৬/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ ২টা থেকে ৩টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত ওসীয়্যতকারী সদস্যদেরকে নিয়ে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সম্মেলনের শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, জনাব নাজমুল ইসলাম সরকার। সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন মোহতরম আব্দুর রহমান সাহেব, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা। অতঃপর ওসীয়্যতের রূপরেখা ও নিয়মাবলী বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শামছুদ্দিন আহমদ, সেক্রেটারী ওসীয়্যত। ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা খালেদ মুসনাদ খান মুরুব্বী সিলসিলা, সভাপতির বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম প্রেসিডেন্ট সাহেব আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা। সম্মেলনে ১৩ জন ওসীয়্যতকারী সহ ৩৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফতুল্লা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকার উদ্যোগে নও মোবাঈন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২৯ জুন ২০১৮ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১টা ঢাকা জামাতের উদ্যোগে দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে নও মোবাঈন সম্মেলন ২০১৮ শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সালেহ আহমদ (নওমোবাঈন), এরপর দোয়া পরিচালনা করেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। নযম পরিবেশন করেন নাসের আহমদ দোলন, ছাত্র-জামেয়া আহমদীয়া। প্রোগ্রামে সবাই যার যার নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেন যার বিষয়বস্তু ছিলো আমি কিভাবে আহমদী হলাম। জুমুআর নামাযের বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় বেলা ৩টায়। নও-মোবাঈনদের দায়িত্ব ও করণীয় বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সংখ্যা ১০০ জন। নওমোবাঈনের সংখ্যা ৮২ জন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১ জন বয়আত গ্রহণ করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

সেক্রেটারী নও-মোবাঈন
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে আয়োজিত দিন ব্যাপী আতফাল দিবস অনুষ্ঠিত

গত ০৮/০৮/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আশকোনার উদ্যোগে আয়োজিত দিন ব্যাপী আতফাল দিবস সফলতার সাথে পালিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। কুরআন পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে সিলেবাস অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সবশেষে স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব এনামুল হক রনি সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে উপস্থিত ছিলেন জনাব মিরাজ উদ্দিন আহমদ (বাবু) (কায়েদ ম. খো. আ. আশকোনা, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব জাকির হোসেন সাহেব। আতফাল দিবসে মোট উপস্থিত সংখ্যা ছিল ১৯ জন।

মিরাজ উদ্দিন আহমদ (বাবু), কায়েদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আশকোনা

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৭ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে

আমার বড় মেয়ে জামিয়া ইসমিতা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর পশুপালন অনুষদ থেকে "অনার্সে সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য গত ২৫ জুলাই, ২০১৮ইং তারিখে প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক ২০১৭ পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে সে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পশুপুষ্টি (Animal Nutrition) বিভাগে মাষ্টার্সে অধ্যয়নরত। গত, ০৩/০২/২০১৮ইং তারিখে কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় ধানীখোলা জামাতের মরহুম হাফিজ উদ্দিন আহমদ এর পুত্র আতিক আহমেদ এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। আমার মেয়ে এবং জামাই এর আধ্যাত্মিক ও জাগতিক এবং দাম্পত্য জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ও
বেগম হাদিয়া রহমান

নারায়ণগঞ্জ-এ মিশনপাড়াস্থ মসজিদে মজলিস আনসারুল্লাহ্ কর্তৃক জেলা (আংশিক) বার্ষিক ইজতেমা ২০১৮ অনুষ্ঠিত

কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত বার্ষিক কর্মক্যালেন্ডার অনুযায়ী মোহতরম সদর সাহেবের অনুমোদনক্রমে ২৭ এবং ২৮ জুলাই ২০০৮ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ-এ মিশনপাড়াস্থ মসজিদে ২ দিন ব্যাপ জেলার যৌথ (আংশিক) বার্ষিক আনসারুল্লাহ্ বার্ষিক ইজতেমা ২০১৮ সফলভাবে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। মসলিসসমূহ ছিল নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লাহ এবং সোনারগাঁও। উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় ২৭.০৭.২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯:৩০ মি. থেকে।

সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী, সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান, আহাদনামা পাঠ এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন মোহতরম সদর সাহেব। এরপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন নায়েব সদর আওয়াল মোহতরম নাজির আহমদ। এরপর সাংগঠনিক বক্তব্য রাখেন কায়েদ উমুমী জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী। নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মোহরতরম জেলা নাযেম আলা ঢাকা জনাব খালেদ বিন কাশেম সাহেব। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব। মজলিসের ৬ মাসের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন যয়ীম আলা জনাব শামীম আহমেদ, নারায়ণগঞ্জ এবং জনাব আবু নাসের আহমদ ফতুল্লা এবং যয়ীম জনাব নূর মোহাম্মদ সোনারগাঁও। এরপর মসলিসে আম অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মজলিসের সুবিধা নিয়ে সাধারণ সদস্যদের মধ্য থেকে বক্তব্য শুনা হয়। মোহতরম সদর সাহেব তাদের বক্তব্যের উত্তর প্রদান করেন। এরপর নামায জুমুআ এবং আসর জমা হয়। নামাযের পর মোহতরম জেলা নাযেম আলা সাহেব মজলিস আম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এতে নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব ফজল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারয়ণগঞ্জ। জনাব আব্দুর রহমান, প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. ফতুল্লা। জনাব মৌলানা তাহের আহমদ, মুরব্বী সিলসিলা এবং জনাব খালেদ বিন কাশেম, জেলা নাযেম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে তাহাজ্জুদের প্রোগ্রাম রাখা হয়। ২৮/০৭/২০১৮ তারিখ শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা শুরু হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় ২৮/০৭/২০১৮ তারিখ শনিবার দুপুর ২টা থেকে। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, নায়েব সদর ও মোহতরম সদর সাহেবের সম্মানীত প্রতিনিধি। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী নাসের জনাব কাউসার আহমদ ভূইয়া। উর্দু নযম পরিবেশন করেন প্রথম স্থান অধিকারী নাসের জনাব তৌফিক আহমদ। এরপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মৌলানা খালেদ মুসনাদ খান, মুরব্বী সিলসিলা। জনাব খালেদ বিন কাশেম, জেলা নাযেম আলা, ঢাকা। জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী কায়েদ উমুমী এবং জনাব ফজল মাহমুদ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সভার সভাপতি মোহতরম হালিম আহমদ হাজারী, নায়েব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। পুরস্কার বিতরণ করেন নায়েব সদর সাহেব। এরপর সভাপতি সাহেবের আহাদনামা পাঠ এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে দুইদিন ব্যাপী ইজতেমার সফল সমাপ্তি হয়। ইজেতমায় তিন মজলিসের ৭৯ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিল মোট ৫৩ জন নাসের।

শামীম আহমেদ
যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্
নারায়ণগঞ্জ

শুভ বিবাহ

৩০/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ খাদিজা সাব্বির (সূরভী), পিতা-জি,এম, সাব্বির আহমদ, যতীন্দ্রনগর, থানা-শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ হাসান, পিতা- মোহাম্মদ শামসুল হক, গ্রাম + পোঃ চাঁনতারা উপজেলা-ঘাটাইল, জেলা-টাঙ্গাইল-এর বিবাহ ৩,৬০,০০০/- (তিনলক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০০

১৮/০৬/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ রেজোয়ানা কবির মৌ, পিতা- মোহাম্মদ কবির হোসেন পাটোয়ারী, মৌড়াইল, পো:+জিলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ এমরান আহমদ, পিতামৃত- রশিদ আহমদ, বাশারুক, নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ৩০০,০০১/- (তিনলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০১।

১৭/০৬/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ নাহার, পিতা- মোহাম্মদ আঙ্গুর মিয়া, দক্ষিণ অষ্টগড়িয়া, পোঃ আচমিতা, থানা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ ফরহাদ আহমদ শিহাব, পিতা মৃত- লুৎফর রহমান মিলন, বড় খালের পাড়, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০২।

২৯/০৬/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ নুসরাত জামান, পিতা- মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান, ১৩৪/১, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-এর সাথে নুরুদ্দীন আহমদ, পিতা- মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন, রোড, নং-২৮, বাড়ী নং-১, মোহাম্মদী হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০৩।

১৫/০৫/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ সামিয়া আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ দ্বীন ইসলাম, গ্রাম-শালসিরি, পো: ফুলতলা, থানা-বোদা জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, পিতা- মোহাম্মদ ইসলাম মিয়া, গ্রাম-কশাইটুলি, পোঃ মাহিগঞ্জ, জেলা-রংপুর-এর বিবাহ ১০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০৪।

১৫/০৫/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ রিপনা আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, গ্রাম-শালসিরি, পো: ফুলতলা, থানা-বোদা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আল-আমীন আহমদ (রাজু), পিতা- মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া, গ্রাম-দেওয়ানটুলি, পোঃ মাহিগঞ্জ জেলা-রংপুর-এর বিবাহ ১,০৫,০০০/- (একলক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০৫।

০১/০৭/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ রাশিদা খাতুন, পিতামৃত- মোহাম্মদ ফটিক মোড়ল, গ্রাম-মিরগাং, পো: যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর সাথে এস, এম, রেজাউল করিম, পিত-এস, এম, আব্দুর রশিদ, গ্রাম-মিরগাং, পো: যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০৬।

১৩/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ সীমা খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ আবু সাইদ প্রামাণিক, গ্রাম- মেরিগাছা, পো: লক্ষীচামারী, থানা-বড়াইগ্রাম, জেলা-নাটোর-এর সাথে মোহাম্মদ রেজউল করিম লিটন, পিতামৃত- মমতাজ উদ্দিন, তারাগঞ্জ, দাক্ষিণ কুড্ডা, রংপুর-এর বিবাহ ৪,৮০,০০০/- (চারলক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০৭।

১৩/০৪/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ মরিয়ম, পিতা- মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, গ্রাম-কাজিরচর, পো: বৈরাগীরচর, থানা-কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে মোহাম্মদ ফুরকান, পিতা- মোহাম্মদ চাঁন মিয়া, গ্রাম- তেরগাতী, পো:- মুমুরদিয়া, কটিয়াদী, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ২,৮০,০০০/- (দুইলক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০৮।

০৬/০৭/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ সাজিথা কাজল, পিতা- মোহাম্মদ খালিদুর রহমান ভূঞা, গ্রাম+পো: বাসুদেব, উপজেলা+জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ গোলাম রাব্বী, পিতা- মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, গ্রান্ড হোটেল মোড়, রংপুর-এর বিবাহ ৭,২০,০০০/- (সাতলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০৯।

০৬/০৭/২০১৮ তারিখ মোসাম্মৎ সাদিয়া আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ সাদেক আহমদ মীর, গোয়ালপাড়া, ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ রাশেদ মিলন, পিতা- মোহাম্মদ কালু মিয়া, মাহিগঞ্জ, রংপুর-এর বিবাহ ১৫,০১৫০০/- (পনেরলক্ষ এক হাজার পাঁচশত) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর : ১৫০৯।

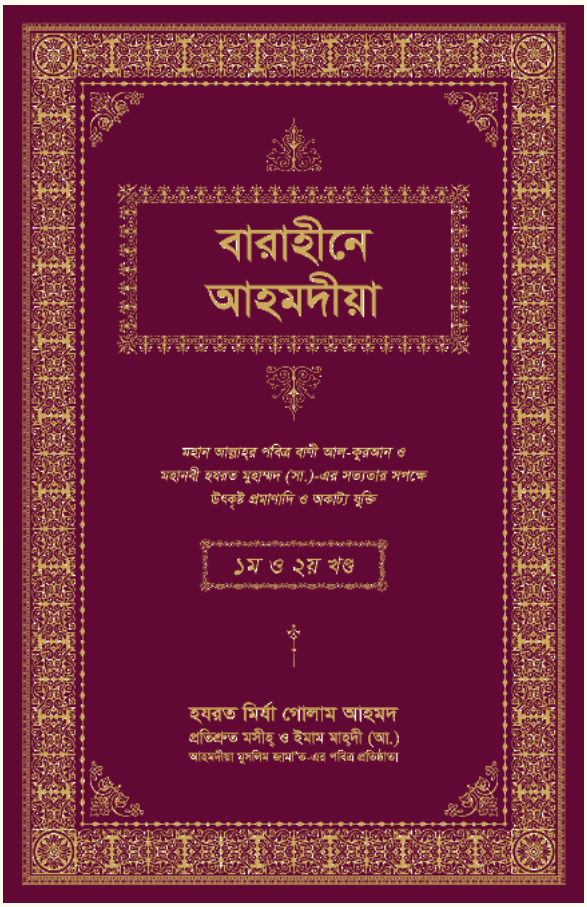

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

মরহুম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী ১৯৯৩ সালের ২৭ জুন **"কেমন করে আহমদী হলাম"** নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাটিতে তার ও তার স্ত্রীর আহমদীয়াত গ্রহণের পটভূমি ও ঘটনা বিধৃত হয়েছে। ঘটনাগুলি একাধিক ঐশী নিদর্শনে পরিপূর্ণ। একদিকে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব অন্যদিকে আহমদীয়াত তথা হযরত ইমাম মাহদীর (আ.)-এর আগমন ও তাঁর সত্যতার প্রমাণ এসব নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

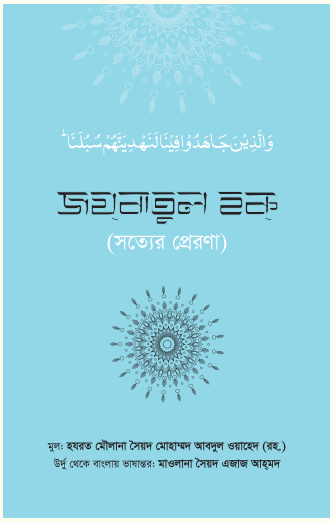

জয্‌বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 81 | 2nd & 3rd Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th August, 2018 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

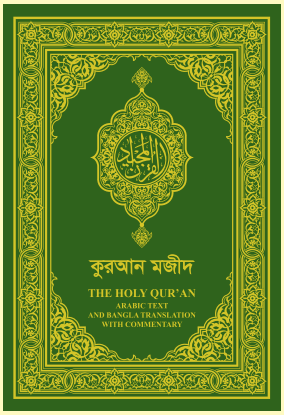

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সহজবোধ্য আরবি অক্ষরে নতুন করে **পবিত্র কুরআন মজীদ** মুদ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইশায়াত দপ্তরে এর পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সংরক্ষিত আছে। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণকে **পবিত্র কুরআন মজীদ** সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। কুরআন শরীফের হাদীয়া নির্ধারণ করা হয়েছে– **৫০০/-** (পাঁচশত টাকা)।

নিবেদনান্তে–
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ইশায়াত

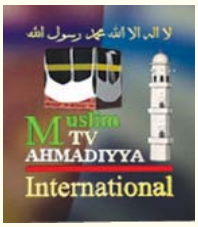

mta
INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

জানিয়া রাখা উচিত যে, কেবল মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আমার শিক্ষানুযায়ী পূর্ণভাবে কাজ করে, সে আমার সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যাহার সম্বন্ধে খোদা তা'লার বাণীতে এই ওয়াদা রহিয়াছে যে, اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ অর্থাৎ 'তোমার গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে যাহারা বাস করে, আমি তাহাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করিব। (কিশ্‌তিয়ে নূহ্, পৃ-১২)

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)